মধ্যরাতের মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৬

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন : গৌতম রায়

মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

উৎসর্গ

রুবি গুপ্ত ও রামচন্দ্র গুপ্তকে

আমার যখন মোটে তিনদিন বয়েস, সেই সময় আমার মা মারা যায়। আমি তখন মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিলাম। কুকুর-ছ্যানারা যেমন মায়ের বুকে ঢুঁসো মারে,আমিও ত্যামনি, বুইঝলে! মা যে মরি গ্যাছে তা জানতেও পারি নাই। স্পষ্ট মনে আছে, মায়েরে টেনে নিয়ে গ্যালো, আর আমি ট্যাঁ ট্যাঁ করে কানতে লাগলাম।

তুমি ভাবতে পারো, সে কথা আমার মনে থাকলো কী করে। তিন দিন বয়সের শিশু, তার তখন ভালো করে চক্ষুও ফোটে না, সেই সময়ের কথা কি কারও মনে থাকতে পারে? ঠিক। হয়তো অন্যদের কাছে শুনে শুনে আমি ছবিটি গড়েছি। আমি য্যানো স্পষ্ট দেখতে পাই, কুকুরের বাচ্চার মতন মরা মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে আছি আমি এক তিন দিন বয়েসের শিশু।

তোমারে আমি মিছে কথা কবো ক্যান, কও? মিছে কথা কয়ে আমার কী লাভ? তুমি আমারে অর্থ দেবে, না পরমার্থ দেবে? মিছে কথা কইতে গেলেই আমার জেহ্বায় যেন সূচ বেঁধে। সত্যিই আমি আমার মরা মায়ের মুখখানা দ্যাখতে পাই।

সবাই বলে, বড় চিলকান্না কানতাম আমি। কেন্দে কেন্দে মাঝে মাঝে দম আইটকে শিবনেত্র হয়ে যেত। বাবা তখন বড় ধড়ফড় করতেন। আমি তার একমাত্র সন্তান। অবশ্য প্রথম পক্ষের। বাবা পরে আবার বিবাহ করিছিলেন, সে পক্ষে তাঁর অনেক সন্তানাদিও হয়েছিল। যাক, সে অন্য কথা।

বাড়িতে তখন মেয়েমানুষ বলতে ছিল আমার এক পিসী। একে বালবিধবা, তায় বাঁজা। অর্থাৎ কিনা বাড়ির দাসী বাঁদীর মতন। সেই পিসী আমারে বুকে লয়ে এদিক সেদিক ঘোরে আর আমার কান্না থামাবার চেষ্টা করে। সেই ছবিটিও আমি স্পষ্ট দেখি। আমাদের বাড়ি ছিল কাঁচা মাটির বাড়ি, কাঁচা উঠান, সেই উঠানে

একটা জামরুল গাছ, জামরুলের ফুল দেখেছো? তোমরা শহরের ছেলেপেলে, তোমরা ওসব ছ্যাখবে কোথা থেকে? গুঁড়া গুঁড়া ঝরে পরে মাটিতে। সেই জামরুলের গাছের নিচে দাঁড়ায়ে আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েসী যুবতী বাঁজা পিসী আমারে বুকে লয়ে অ্যা ও অ্যা ও বলে সুর করে করে আমার কান্না থামাচ্ছে আর আমি পিসীর শুকনা বুকে মুখ ঘষতেছি। স্পষ্ট দেখি।

দ্রোণাচার্য ছেলেকে পিটুলি গোলা খাওয়াতেন। সেই জন্যেই তো ঐ ছেলের ঐ পরিণাম। অশ্বত্থামা কোনো ভালো কাজ করিছে তুমি আমারে দেখাতে পারো? মায়ের বুকের দুধ না খেলে ছেলে-পুলেরা অকালকুষ্মাণ্ড হয়। তাই আমি সকলরে বলি, আমার কাছে যে সব মেয়েরা আসে তাদের বলি। বেশী ফেসিয়ান করো না। ছেলেমেয়ে হলে টানা ছ্যাড় বচ্ছর বুকের দুধ খাওয়াবে। মায়ের বুকের দুধ খেলে ছেলেদের অঙ্কে মাথা হয়। পণ্ডিত নিউটন সাহেব তিন বচ্ছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খেয়েসেন।

হ্যাঁ, যা বলতেছিলাম। আমার তিন দিনের দিন তো মা গ্যালেন। অতটুকু বাচ্চার প্যাটে গোরুর দুধ সয় না। আর তখনকার দিনে তো গোলা-দুধ, টিনের দুধ এসব বায়ড়ায় নি, আমাদের গ্রাম দেশে ওসব এখনো পাওয়া যায় না। মা-মরা শিশুরে বাঁচানো বড় কঠিন। সুতরাং আমারও মরো মরো দশা। মইরেই যেতাম, মাতৃহীন শিশুর মতন বুঝি এমন দুর্ভাগা আর কেউ নাই, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে আছিল আমারে বাঁচায়ে রাখার। সেই সময় আমাদের গ্রামে এলেন শ্রীশ্রীত্রিলোকনাথ ব্রহ্মচারী। নাম শুনেছো তাঁর?

শোনো নাই, তা তোমার মুখ দেখেই বুইঝতে পারা যায়। শত শত গ্রন্থে তাঁর কথা লেখা আছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁরে পুজা করে। তুমি যা তাঁর নাম শোনো নাই, তাতে ত্রিলোকনাথ প্রভুর কোনো ক্ষতি নাই, ক্ষতি তোমারই। তুমি হিমালয় পর্বত দেখো নাই, তাতে হিমালয়ে কি কোনো ক্ষতি হইছে?

সেই যে ছোট বয়েসে একবার দেখিছি, আর কখনো তাঁরে চর্মচক্ষে দেখি নাই। মানস নেত্রে অবশ্য বহুবার তিনি কৃপা করে

আমায় দেখা দিয়েসেন। তবে অতি শৈশবে যেম স্বপ্নেও সেই একই প্রকার দেখি। শরীর না যেন কাঠ। হাঁড় পাজর গোনা যায়। মাথার চুল বোঝা যায় না, চন্দ্রবোড়া সাপ য্যানো মাথার উপরে কুণ্ডলি পাকানো। দুই চক্ষে অসীম করুণা ও দারুণ তেজ। অমন চক্ষু মানুষের হয় না।

হ্যাঁ, যা বলতেছিলাম। আমাদের বাড়িতে কাজ-কাম করতো হারাণের মা। জাতে নমঃশূদ্র, কিন্তু ঠিক য্যানো আমাদের বাড়ির লোকই, শুধু খাওয়ার জলটা সে ছুঁইত না, আর সব কাজই সে করতো। তা সেই হারাণের মা এসে আমার পিসীরে বললে, ঠাকরুন, মস্ত বড় সন্নেসী এয়েছেন, তার কাছে নিয়া একটু পোলাটারে ছাখান না ক্যান। পোলা মানে বোঝো তো? ছেলে? তোমরা যেমন ছেলেপুলে বলো, সেই পুলে হোলো গে আমাদের পোলা। তোমরা বলো ছেলেমানুষ, সে বড় মজার কথা, ছেলে আবার মানুষ কী? আমরা বলি পোলাপান। মায়ের মৃত্যুর পর আরও পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে, আমার তখন প্রায় অক্কা পাবার দশা, পিসী আমারে কোলে নিয়ে ছুটলেন বাবা শ্রীশ্রীত্রিলোকনাথ ব্রহ্মচারীর সমীপে।

যোগেন মল্লিক ছিলেন আমাদের গ্রামে খুব প্রতিষ্ঠাপন্ন মানুষ। তাঁর এক ছেলে রূপলাল মল্লিক কলকাতার হাইকোর্টে জজ হয়েছিলেন। নাম শোনোনি রূপলাল মল্লিকের? একসময় রূপলাল মল্লিকের খুব সুখ্যাত বেরোয়েছিল খবরের কাগজগুনিতে। অবশ্য তখন তোমাগো জন্ম হয় নাই, সে সময় বৃটিশ আমল। রূপলাল মল্লিক এক ইংরেজের ফাঁসীর হুকুম দিয়েদিলেন। ভেবে ছাখো একবার! তাঁরই আর এক ভাই ঢুকেছিলেন আর্মিতে, খুব বড় পোস্ট, ব্রিগেডিয়ার চুনীলাল মল্লিক। তাঁর নামও শুনে থাকর্তে পারো। খুব লেখাপড়া জানা পরিবার। সেই যোগেন মল্লিকের বাড়িতে এসে উঠেছিলেন ঠাকুর। অতবড় যোগীপুরুষ খুব কম জন্মেছেন। তাঁর তুলনায় আমরা কী, কীটাণুকীট। তাঁর কণামাত্র দয়া যে পেয়েছে, সে-ই তরে গেছে।

একটু
হ্যাঁ, যা বলতেছিলাম। আমারে পিসীর কোলে দেখে ঠাকুর ভাবলেন আমি বুঝি ঐ পিসীরই সন্তান। তিনি হাত তুলে আশীর্বাদ করে পিসীরে বললেন, তুই ভাগ্যবতী, ব্রহ্মতিলক-ধারী সন্তান পেয়েছিস। তোর সন্তান দীর্ঘজীবী হোক!

পিসী অমনি কেন্দে পড়লো।

পিসী বললেন, বাবা, এ সন্তান তো আমার নয়। এ যে মা-মরা ছেলে। এরে কী করে আমি বাঁচাবো, সেই কথা বলে দিন।

বাবা বললেন, মা-মরা ছেলে তো কী হয়েছে! তুই ওকে নিজের সন্তানের মতন পালন কর। আমি বলছি যখন, তখন ও ছেলে ঠিকই দীর্ঘজীবী হবে! ঐ ছেলে আজ থেকে তোর ছেলে।

পিসী তবু কেন্দে ভাসাতে লাগল। হাপুস নয়নে বললে, বাবা, এরে আমি কী খাওয়ায়ে বাঁচাবো? এর প্যাটে যে কিছুই সয় না।

বাবা বললেন, কী আবার খাওয়াবি? বুকের দুধ খাওয়াবি! ঐটুকু সন্তানরে কী খাওয়াতে হয় জানিস না?

পিসী বললো, বাবা, আমি যে বাঁজা মেয়েমানুষ, আমার বুকে দুধ কোথায়? আমি পোড়াকপালী! ওর মায়েও ছেলেটারে ফেলে পালালো।

যোগীরাজ ত্রিলোকনাথ ব্রহ্মচারী পিসীরে এক বড় ধমক দিয়ে বললেন, কে বলেছে তুই বাঁজা? (অন্তরে যদি মাতৃস্নেহ থাকে তবে বক্ষে অমৃতধারা বয়।) ছেলেরে মুখে তুই মাই গুঁজে দে, ছাখ দুধ বায়রায় কিনা।

তিনি কথাটা উচ্চারণ করতে না করতেই আমার পিসীর দুই স্তন দিয়ে ঝরঝর করে দুধ বায়রাতে লাগলো। আঁচল ভিজে গেল। তখনকার দিনে তো আর বেলাউজ পরার রীতি ছিল না গ্রাম দেশে, সেমিজ পরতো মেয়েরা, তাও বিধবাদের সেমিজ পরা নিষেধ ছিল। উপস্থিত অনেক নারী পুরুষ ছিল, তারা সেই দৃশ্য দেইখে হতবাক। পিসী ভাবের ঘোরে মুচ্ছো গেল, সেই অবস্থাতে আমি দুধ পান করতে লাগলাম। বুঝলে বিশ্বদেব, আমার স্পষ্ট মনে আছে, হ্যাঁ, আমার তখন আট ন' দিন বয়েস, তবু আমি সে দৃশ্য স্পষ্ট ছাখতে

পাই। দৈবী দুগ্ধ পান করে গড়ে উঠেছে আমার দেহ অমৃত খেয়েছি, তারপর আর সারাজীবন আমার কিছু না খা চলে। এখন যা খাই, তা শুধু চক্ষের নেশায়।...চার পাঁচ বছরেও পিসীর বুকের দুধ শুকোয়নি। এ ঘটনা সারা বাংলা দেশের লোক জানে। বাবা শ্রীশ্রীত্রিলোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী বইতেও একথা ল্যাখা আছে দেখে নিও। আরো অনেক মহাপুরুষ এমন পারেন।

কী তোমার বুঝি বিশ্বেস হলো না, বিশ্বদেব?

আজ্ঞে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস করার আমি কে?

তার মানেই অবিশ্বাস! এসো তোমারে বিশ্বাস করায়ে দিচ্ছি। এগোয়ে এসো আমার দিকে।

দেয়ালে একটি পুরোনো আমলের ঘড়ি। এইসব ঘড়ি আগে একটু গলা খাঁকারি দেবার মতন খর খর শব্দ করে তারপর ঢং ঢং শব্দে বাজে। এখন বাজলো বারোটা। মধ্যরাত।

এক বিখ্যাত বিপ্লবীর নামে রাস্তা। অধিকাংশ বাড়িই এখন ঘুমন্ত। পথের ওপর একটি নব-প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির, তার দু'পাশে দুটি শ্বেতপাথর বসানো ঘর। দক্ষিণের ঘরটিতে বসে আছেন সাধক শ্রীযোগানন্দ আচার্য। পূর্বে তাঁর নাম ছিল নরেশনাথ চক্রবর্তী, তখন তিনি ফুড ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। এখন নরেশ বলে ডাকবার মতন লোক বিশেষ কেউ বেঁচে নেই।

যোগানন্দ স্বামী কোনো রাত্রেই ঘুমোন না। তাঁর সাজপোশাকের বিশেষ ভড়ং নেই। একটি গেরুয়া ধুতি পরে থাকেন। মাথার চুল পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো, তিনি নিয়মিত দাড়ি কামান এবং সারা দিনে প্রায় পনেরো কাপ চা খান। তিনি সারারাত বসে থাকেন পদ্মাসনে, শিরদাঁড়া টান টান করে। পুজো করেন খুব অল্প সময়। তিনি বঙ্কিম রচনাবলী পাঠ করছেন ইদানীং। লোকে বলে, সমগ্র মহাভারত নাকি তাঁর মুখস্থ। সংস্কৃত এবং বাংলায়।

তাঁর সামনেই মেঝেতে বাবু হয়ে বসে আছে বিশ্বদেব সেনগুপ্ত, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, একটি বড় বাংলা সংবাদপত্রের রিপোর্টার। তবে তরুণ রিপোর্টারদের মধ্যে বিশ্বদেব এক হিসেবে

একটু ... ধুতি ও পাঞ্জাবি পরে। তার হাতে জ্বলন্ত

হ্যা ... ন্দ স্বামী তাঁকে সিগারেট খাওয়ার অনুমতি

ভা ... ন নিজেও মাঝে-মধ্যে দু'একটা সিগারেট অন্যদের

নিয়ে খান, দু' আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে

হাতে ... গোল করে টানেন ঠিক গাঁজার ভঙ্গিতে। যোগানন্দ স্বামী অবশ্য গাজা খান না।

বিশ্বদেবের হাতে নোট-প্যাড ও কলম। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনার জন্ম কোন্ সালে?

যোগানন্দ বললেন, নাইনটিন ইলেভেন। সেই যে সালে মোহন-বাগান টীম গোরাদের হারায়ে দেয়। তোমার বাবাও বোধহয় তখন জন্মান নাই!

আপনাকে দেখলে কিন্তু বোঝা যায় না আপনার এত বয়েস!

কত মনে হয়?

বড় জোর পঞ্চাশ!

আসলে আমি অকালবৃদ্ধ। আমার যখন বেয়াল্লিশ বছর বয়েস, তখনই আমায় বুড়োটে দেখাতো, লোকে তখনই আমারে দেখে বলতো পঞ্চাশ-বাহান্ন বয়েস হবে বুঝি। তখন আত্মবিস্মৃত ছিলাম তো! ঠিক বেয়াল্লিশ বছর পাঁচ মাস এগারো দিনের মাথায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। তারপর থেকে আমার শরীর এই জায়গায় থমকে রয়েসে। ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। এগোয়ে এসো! তোমারে বললাম না এগোয়ে এসো!

কেন?

তুমি আমার কথা বিশ্বেস করতেছ না। তোমার চক্ষু দেখেই আমি বুঝতে পারতেছি। শোনো, মানুষের মধ্যে বুজরুকি করা আমার কাজ নয়। মিথ্যারে আমি অন্তর থিকা ঘৃন্না করি।

আজ্ঞে, আমার মা আপনাকে ভীষণ ভক্তি করেন!

তুমি ভাবতেছ, তোমার মা মেয়েমানুষ, সে তো ভক্তি করবেই। মেয়েমানুষরা সহজেই ভক্তিতে গদো গদো হয়ে যায়। কিন্তু তুমি ল্যাখাপড়া জানা শিক্ষিত ছেলে, তুমি যদি সাধু-সন্ন্যেসীতে বিশ্বাস

করো, তা হলে তোমার মান যাবে! কেমন তাই না?

আমার মন আমি খোলা রেখেছি।

কচু রেখেছো। তুমি তোমার মনের খবর কিছুই জানো না। এগোয়ে এসো। আমার একেবারে সামনে।

আপনি আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন?

আমি তোমারে ভক্ত বানাইতে চাই না। তোমারে শুধু আমার কথাগুলি বিশ্বাস করাইতে চাই।

বিশ্বদেব তখনও দ্বিধা করছে দেখে যোগানন্দ ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি এই যে পদ্মাসনে বসিছি, সারা রাত্র এখান থেকে একবারও উঠি না, সুতরাং তোমারেই আমার কাছে আসতি হবে। এসো—

বিশ্বদেব যোগানন্দের হাতে ছোঁয়া দূরত্বের মধ্যে চলে এলো।

যোগানন্দ আদেশ করলেন, মাথা নিচু করো।

বিশ্বদেব তার মাথাটা নোয়াবার পর যোগানন্দ আলতো করে তাঁর ডান হাতটি ঠিক ব্রহ্মতালুতে ছোঁয়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেবের সারা শরীরটা কেঁপে উঠলো। ঠিক যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন অবস্থা, ভেতরে যেন শব্দ হলো ঝনঝন করে।

সে চমকে মাথা সরিয়ে নিয়ে বললো, এ কী!

যোগানন্দ নিঃশব্দে মৃদু হাস্য করলেন।

বিশ্বদেব প্রগাঢ় অভিভূত গলায় জিজ্ঞেস করলো, কী হলো? আপনি আমায় কী করলেন?

কিছু বুঝলে?

দারুণ শক খেলাম যেন। কী করে হলো?

আমি বুজরুকি দেখাই না। ম্যাজিক দেখাই না। হাওয়া থেকে ফুল কিংবা সন্দেশ গুজিয়া তৈরি করার ক্ষমতা আমার নাই। আমি তোমায় শুধু আমার স্পর্শটা বুঝালাম।

বিশ্বদেব পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলো। তার মাথা এখনো ঝিমঝিম করছে। এ ঘরে বিদ্যুৎ নেই, একটা হ্যাজাক লণ্ঠন ঝোলানো রয়েছে শিলিং থেকে। পুরো ব্যাপারটা এখনো

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে বিশ্বদেবের।

যোগানন্দ বললেন, এই জন্য আমি বেয়াল্লিশ বৎসরের পর থেকে আর নারীসঙ্গ করি না। গুরু আমারে রক্ষা করেসেন। সংযমের জইন্য আমারে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় নাই, আমার পক্ষে আর ভোগ করাই অসম্ভব। স্ত্রীলোকেরা আমার স্পর্শ সহ্য করতে পারে না। সেইজন্য কারুরে প্রণাম করতে পর্যন্ত দেই না আমি।

আপনার পিসী বেঁচে আছেন?

যোগানন্দ নিজের বুকের ঠিক মাঝখানে আঙুল দিয়ে বললেন, বেঁচে রয়েসে এইখানে। যাদের শরীরে বিভূতি প্রকাশ পায়, তারা বেশীদিন পৃথিবীতে থাকে না। বুকের দুধের নামে আমার পিসী আমারে যা খাওয়াইতেন, সেটা হইলো তার আয়ু। বুঝলে? আমার যখন সাত বছর বয়েস, আমারে সাজায়ে গুজায়ে ইস্কুলে পাঠায়ে পিসী নিশ্চিন্দে মরে গেল। তখন আমার বাবা আবার বিবাহ করেসেন।

আমার কিন্তু মাথা ঝিমঝিম করছে এখনো!

তিনদিন থাকবে ওরকম। তবে ভয় নাই কিছু।

আরো কী সব প্রশ্ন করবো ভেবেছিলাম, সব গুলিয়ে গেল!

তাড়াহুড়া নাই। কাইল এসো, পরশু এসো, যেদিন খুসী তোমার এসো।

আচ্ছা, আপনি একসময় চাকরি করতেন, তারপর সব ছেড়ে-ছুড়ে সন্ন্যাসী হলেন…

সন্ন্যেসী হই নাই, সাধক হয়িসি।

হঠাৎ-ই একদিন এরকম মনে হলো?

ঐ যে কইলাম, বেয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ঘুমন্ত ছিলাম, অনেক অসঙ্গ কুসঙ্গও করিছি, তারপর একদিন ঘুমের মধ্যে শ্রীশ্রীত্রিলোকনাথ ব্রহ্মচারী আইসে দেখা দিলেন। চোখ গরম কইর‍্যা ধমক দিয়া কইলেন, নচ্ছার! এইজন্য তোরে বাঁচাইয়া রাখছি? তুই মানুষের উপকার করবি, তা না শুধু আত্মসুখের চিন্তা! সেই দিন থেকেই আমার চৈতন্য হলো।

আপনি মানুষের কীভাবে উপকার করেন !

নিরাশকে আশা দেই। দুঃখীকে দেই সান্ত্বনা। শুধু এইটুকু, আর কিছু না। ✓/

আপনি ওষুধও দেন !

না, ওষুধ দেই না।

ওষুধ দেন না ? কত লোক আপনার কাছ থেকে ওষুধ নিতে আসে। আমার মাকে আপনি তেল দিয়েছেন। ঘাড়ের বহুকালের ব্যথা। সেই তেল লাগিয়ে অনেকখানি সেরে গেছে।

ওটা ত্যাল নয়। তোমার মায়েরে আমি যা দিছি, তার নাম বিশ্বাস।

শুধু বিশ্বাস করে লাগালেই যে-কোন জিনিসে সকলের রোগ সারবে ?

না। সকলের সারে না। বাবা বিশ্বদেব, ছাখো তো আকাশে জ্যোৎস্না ফুটেছে কিনা !

ঘরের একটি দরজা কালীমন্দিরের দিকে, আর একটি দরজা দিয়ে পেছনের দিকে যাওয়া যায়, সেদিকে স্নানের জায়গা। একটি মাত্র জানলা, সেটি বন্ধ ছিল, বিশ্বদেব খুলে বাইরে তাকালো। আকাশটা ঘোলাটে মেঘলা, বোধ হয় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়ছে।

জানলাটা খোলাই থাক্।

বিশ্বদেব ফিরে এসে বললো, না জ্যোৎস্না নেই।

যোগানন্দর মুখখানি যেন ম্লান হয়ে গেল। তিনি উদাসীন গলায় বললেন, আজ শুক্লা দ্বাদশী। ছাখো, মাসের মধ্যে পনেরো দিন চাঁন্দ থাকে। পনেরো দিন থাকে না। সেই পনেরো দিনও যদি চাঁন্দের আলো না ফোটে, তা হইলে বড় কষ্ট হয়।

বিশ্বদেব হাসতে লাগলো।

তুমি হাসছো ?

এরকম অদ্ভুত কথা কখনো শুনিনি ! আপনারা তান্ত্রিকেরা তো শুনেছি অন্ধকারই—মানে, অমাবস্যাই বেশী পছন্দ করেন !

অনেক রাত্র হয়েছে, তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমার মার চিন্তা করবে না?

আমাদের যা চাকরি, অনেক সময় অফিস থেকে রাত দেড়টা দুটোয় বাড়ি ফিরি। আচ্ছা, বাঙ্গালোরের সাঁইবাবা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

আমার মতে সকলেই মহাপুরুষ।

আজকাল সাধু-সন্ন্যাসী হঠাৎ এত বেড়েছে কেন বলতে পারেন? চতুর্দিকে শুনি—লোকেও খুব ছোটে এঁদের পেছনে।

ধানের উৎপাদন বেড়েছে, মানুষের সন্তান উৎপাদন বেড়েছে, সেই নিয়মেই সাধু-সন্ন্যাসীদের সংখ্যা বেড়েছে।

এটা কোনো লক্ষণ বলতে চান?

যোগানন্দ স্বামী উত্তর না দিয়ে চোখ বুজলেন। হাত দুটি কোলের ওপর জোড় করে রাখা। ধ্যানের ভঙ্গী। এটা তাকে চলে যেতে বলার ইঙ্গিত কিনা বিশ্বদেব ঠিক বুঝতে পারলো না। একজন মানুষ শুধু হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে শরীরে ঠিক ইলেকট্রিক কারেন্টের মতন ব্যাপার হয়? এটা কী করে সম্ভব? অফিসের সহকর্মীদের বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, সবাই হাসবে। একমাত্র অলকেন্দু ব্যানার্জি বিশ্বাস করতে পারে। সে আবার খুব ভক্ত ধরনের, রিপোর্টের কপির ওপর লেখে জয় রামকৃষ্ণ।

যোগানন্দ স্বামী চোখ খুলে বললেন, জ্যোৎস্না ফুইটবে, রাত্র একটা পঁয়ত্রিশ মিনিট গতে—

আপনি কী করে টের পেলেন?

সব কথা জিজ্ঞেস করতে নাই। যেমন মানুষ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না!

সত্যজিৎ রায় কী বলেছেন জানেন? জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী যদি দু'একটা মিলেও যায়, তাও উনি বিশ্বাস করবেন না! কারণ মিলে যাওয়া এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

উনি অসাধারণ মানুষ। ওঁর বিশ্বাস করার দরকার নাই। ওঁরা আপন মনে চলার পথিক।

আমি ভেবেছিলাম আপনি সত্যজিৎ রায়ের নাম শোনেননি। আপনি কি সিনেমা-টিনেমা দেখেন?

না। কিন্তু আমি খবরের কাগজ পড়ি। এরকম আর একজন লোককে জানি, সে নামকরা কেউ না, কিন্তু তারে দেখে আমারও প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়েছিল। কী অসাধারণ তার অবিশ্বাস। বিশ্বাসের মতন অবিশ্বাস কখনো খুব তীব্র হয় না. একটু ঠেলা মারলেই অবিশ্বাসীরা টলে পড়ে। তবু এক-একজন থাকে। সেইরকম একজনকে দেখিছি, আর একদিন তোমারে তার কথা শোনাবো। আজ বাড়ি যাও!

আপনি সারারাত্রি এই রকম ঠায় বসে থাকবেন?

সেই বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সের পর থেকে প্রতি রাত্রেই এরকম থাকি।

একদিন আমিও সারারাত আপনার এখানে জেগে দেখবো। কেন, এরকমভাবে জেগে বসে থাকেন কেন?

রাত্রির নিস্তব্ধতা আমার শরীরে শোষণ করি। নিস্তব্ধতা আত্মার খুব ভালো খাদ্য। আর আশায় আশায় থাকি, যদি মায়ের দেখা পাই।

মানে···ইয়ে···মা-কালী!

না, না! জগজ্জননীর রূপ খালি চোখে দেখে সইহ্য করতে পারে কয়জনে? না, আমি তা চাই না। আমি কি সাধক রামপ্রসাদ, না শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ? আমি অতি সামাইন্য। আমার এ মাটির মূর্তিই ভালো। আমি দ্যাখতে চাই আমার নিজের মাকে। যারে কখনো দেখি নাই, তারে দ্যাখতে চাই। বড় কঠিন, বুইঝলে, বড় কঠিন!

আপনি যে বললেন, আপনার মাত্র তিনদিন বয়েসে মৃত মাকে দেখতে পান? আপনার মনে আছে?

সে তো মড়া মুখ। আমি আমার জীবন্ত মায়েরে দ্যাখতে চাই। একদিন না একদিন পাবোই···

বিশ্বদেব ধুতির কোঁচাটা তুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে চলেছে। আকাশ পরিষ্কার হবার কোনো লক্ষণ নেই।

মন্দিরের সামনে ফুটপাথের ওপর একটি টিনের শেড। দিনের বেলা ভক্তরা এসে ওখানে দাঁড়ায়। মন্দিরটির জনপ্রিয়তা এবং আয়তন দিন দিন বাড়ছে। দু'তিন বছর আগেও বিশ্বদেব এখানে শুধু একটা ছোট্ট মন্দির দেখেছিল।

টিনের শেডটার নিচে এখনও শুয়ে আছে কয়েকটি ভিখিরি। কয়েকজন জেগেও আছে। তিন-চারটে ছেলে এত রাতেও রাস্তার আলোয় তাশ খেলছে। তাদের হাতে হাতে ঘুরছে একটা কল্কে। খুব সম্ভবত গাঁজা। একটু দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে, গায়ের রং কুচকুচে কালো কিন্তু মুখখানি বেশ ঢলঢলে। ওকে চেনে বিশ্বদেব, ওর নাম কুসমী। অদ্ভুত নাম। কালো রঙের কোনো ফুল হয়?

আবার ভেতরে ফিরে গেল বিশ্বদেব। যোগানন্দ স্বামী চোখ মেলে আছেন বলে সে বিনীতভাবে বললো, আবার বিরক্ত করতে এলাম, সাংবাদিক হিসেবে আপনাকে আমি আর একটা প্রশ্ন করতে বাধ্য, যদি কিছু মনে না করেন—

একটা কেন, একশোটা প্রশ্ন করতে পারো। কিন্তু সবই কি আইজই হবে? তোমারে তো আবার আমার কাছে আসতে হবে আমি জানিই।

কেন? কী করে জানলেন?

সে কথা থাক। তোমার প্রশ্নটা বলো।

দেখুন, এই যে মন্দির বানিয়েছেন, সেই সঙ্গে আরও ঘর, বাইরের শেড, সবই রাস্তা দখল করে—। কলকাতায় রাস্তা-ঘাটের তো একেই যাচ্ছেতাই অবস্থা। তার ওপর যদি এরকমভাবে জবর-দখল হয়—

মা-কালীর সামনে গিয়া প্রণাম করে তোমার এ প্রশ্নের উত্তর জেনে নাও।

সাংবাদিকরা কিন্তু এরকম উত্তর পেলে খুশী হয় না।

অর্থাৎ তোমারে খুশী করতে হবে। বেশ। শোনো, আগেকার কালে দেশের রাজা কিংবা জমিদার নতুন নতুন মন্দির বানায়ে

দিতেন। এখন রাজাও নাই। জমিদারও নাই। সরকার নাস্তিক। তা বলে কি মানুষের জন্য নতুন নতুন ধর্মস্থান গড়ে উঠবে না? সেই জন্যই আমি সরকারের জমি নিয়া মন্দির বানাইছি। এজন্যে আমার মনের মধ্যে কোনো গ্লানি নাই। এবার পাইলা তোমার উত্তর?

রাজা বা জমিদার নেই, সরকারও মন্দির বানায় না, কিন্তু ব্যবসায়ীরা বানায়। এখনও বানাচ্ছে চারদিকে।

ব্যবসায়ীদের মন্দির হইলো ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের মতন। বাইরে থিকা বড় সুদৃশ্য, কিন্তু ভিতরে ধর্ম নাই। আইচ্ছা এবার তুমি আসো গিয়া।

বিশ্বদেবের বাড়ি বেশী দূরে নয়। এক সিগারেট পথ। মোড়টা ঘুরলেই। ছ'তলা ফ্ল্যাট বাড়ি। সামনের গেট খোলাই থাকে। চারতলায় নিজেদের ফ্ল্যাটে উঠে এসে কলিং বেল বাজালে মা-বাবার ঘুম ভেঙে যাবে, তাই সে দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ করে। ও পাশেই শুয়ে থাকে তাদের বাড়ির কাজের লোকটি, সে উঠে দরজা খুলে দেয়।

মা ঠিক জেগে উঠলেন। বিশ্বদেব এক-একদিন বাড়ি ফিরে এসে খায় না। সেইজন্য মা ছেলের খাওয়াটা দেখতে চান।

মায়ের গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ব্যাপারটা বিশ্বদেব চেপে গেল। না হলে এখন অনেক কথা বলতে হবে। যোগানন্দ স্বামীর একটা গুণ এই যে, উনি ভক্তদের কাছ থেকে কখনো টাকাপয়সা নেন না। কেউ দিতে গেলেও রাগ করেন। ভক্তরা অবশ্য তবু দেয় নানা ভাবে। ওঁর দু'জন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আছে, তারাও নাকি নানা পাকে-প্রকারে চাপ দেয়। ভক্তরা কেউ যদিও মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারে না তাদের গুরুদেবকে, কিন্তু বিশ্বদেব বলে দিতে পারতো। আর একদিন গেলে সে এই প্রসঙ্গটা তুলবে।

উনি বললেন কেন যে বিশ্বদেবকে আবার যেতেই হবে? মন্ত্র-শক্তি? এরকম সত্যিই কিছু আছে কি? কোনো কোনো সাধু নাকি আফিং মেশানো সন্দেশ খেতে দেন। ভক্তরা বুঝতে পারে না,

কিন্তু তাদের আফিং-এর নেশা হয়ে যায়, সেই টানে গুরুর কাছে যায়। লেনিন বলেছেন, ধর্মই আফিং, তা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় জনগণকে। যোগানন্দ অবশ্য সন্দেশ খাওয়ান নি বিশ্বদেবকে। আচ্ছা, দেখা যাক কী হয়। খাওয়াদাওয়া তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বিশ্বদেব তারপর জামাকাপড় ছাড়লো। ধুতি ছেড়ে পাজামা। এবার রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুতে যাবার আগের শেষ সিগারেটটা সে টানে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে।

কিন্তু আজ আর বারান্দায় দাঁড়াবার উপায় নেই। বৃষ্টি বেশ জোরে এসেছে। বিশ্বদেব দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি উপভোগ করতে লাগলো।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো তার। কটা বাজে?

বিশ্বদেব ঘরের মধ্যে এসে ঘড়ি দেখলো। একটা চল্লিশ। উনি বলেছিলেন এই সময় জ্যোৎস্না উঠবে। মেলেনি। অতই সহজ!

কিন্তু শরীরে সেই বিদ্যুৎ-প্রহারের মতন ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই হয়েছিল। এখনো তার রেশ আছে।

॥ ২ ॥

কুসমীর ছোট্ট জীবনের একটা বেশ বড় ইতিহাস আছে।

তার চোদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত সে কারুর চোখে পড়েনি। সেটাই প্রকৃতির নিয়ম। অন্যান্য চোদ্দ বছরের মেয়েরা যখন ফ্রক পরে এবং এক বেণী করা চুল বেঁধে স্কুলে যায়, সেই সময় কুসমীর অঙ্গে প্রথম শাড়ি ও ব্লাউজ উঠলো। শাড়িটা তাকে দিয়েছিল মোড়ের ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলার বৌদি।

ফ্ল্যাট বাড়িটির ঠিক পেছন দিকেই বস্তি।

চোদ্দ বছর বয়েস পর্যন্ত কুসমী ঐ বস্তিতে তার মাসী-দিদিমার বাড়িতে থাকতো। মাসী-দিদিমা দু'জন নয়, একজনই। মায়ের বোন যদি মাসী হয়, তা হলে দিদিমার বোন কী হবে? কুসমী তাকে ডাকে মাসী-দিদা।

কুসমীর মাসী-দিদা এ পাড়ার এক ডাকসাঁইটে ঠিকে-ঝি।

সকাল-বিকেল মিলিয়ে পাঁচ-ছ বাড়িতে কাজ করে। ছিপছিপে, লম্বা, শক্তিশালিনী নারী, মুখে মেছেতার দাগ, বয়েস বছর পঞ্চাশেক তো হবেই, তার নাম অন্নদা। কোমরে হাত দিয়ে যখন সে চ্যাঁচায়, তখন ও বস্তিতে কাক চিল পর্যন্ত বসতে সাহস করে না।

কুসুমীর বাবা মারা গেছে অল্প বয়েসে, মা নিরুদ্দেশ। কেউ বলে যে কুসুমীর মাকে নাকি এক পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-ড্রাইভার বিয়ে করে একেবারে পাঞ্জাবে নিয়ে গেছে, আবার কারুর কারুর মতে সে নাকি ধানবাদের দিকে এক কয়লাখনির ম্যানেজারের বাড়িতে আয়ার কাজ করে। সে যাই হোক, এই বস্তির সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। সাত-আট বছর বয়েসে অনাথা কুসুমীকে অন্নদা তার নিজের ঘরে স্থান দেয়।

অন্নদার একটি স্বামী আছে, সে ঘরে শুয়ে শুয়ে সময় কাটায়। তার নাকি বাতের ব্যাধি। বস্তির অনেক মেয়েই এরকম একটি বেকার স্বামী পোষে। (বিয়ে-করা স্বামী খেতে পরতে না দিলেও তারা তাড়িয়ে দেয় না, কারণ সেটা পাপ।) অন্নদার স্বামী জয়রাজ একসময় ছুতোর মিস্তিরির কাজ করতো। বছর দশেক সে আর যন্ত্রপাতি ছোঁয় না। ভবানীপুরে এক চেনা বাড়িতে সাইড বোর্ড বানাবার জন্য কাঠ কেনার নামে মাত্র পঞ্চাশ টাকা অগ্রিম নিয়ে সেই টাকাটা সে অন্য কাজে খরচ করে ফেলেছিল। সে বাড়িতে সে আর কখনো ফিরে যায়নি, বোধ হয় সেই ভয়েই সে আর ঘর থেকে বেরোয় না। স্ত্রীর রোজগারে তার দিব্যি চলে যায়।

অন্নদার ছেলেপুলে নেই। একটিই মাত্র ঘরে ঢালাও বিছানা, তাতে কুসুমী ও স্বামীর সঙ্গে শুতো অন্নদা। সাধারণত দশ-এগারো বছর বয়েস থেকেই বস্তির ছেলেমেয়েদের ঠিকে-কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্নদা কুসুমীকে পাঠিয়ে দিল ইস্কুলে। ঠিক একটা পাড়া পরেই পার্কটার এক কোণে কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুল আছে, সেখানে মাইনে লাগে না।

অন্নদা কুসুমীকে বই, শ্লেট কিনে দিয়েছে, রাত্রে হ্যারিকেন জ্বালাবার জন্য সে কেরোসিন তেল খরচ করেছে। এবং সন্ধ্যের পর

ছ'বাড়ির কাজ সেরে সে বস্তিতে ফিরে কুস্মীকে ঘুমোতে দেখলে তার চুল ধরে টেনে তুলে বলতো, হতচ্ছাড়া, পড়াশুনোর নাম নেই, এরই মধ্যে ঘুম! শেষে কি আমার মতন ঝি-বাঁদী হবি! মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেবো তোর। পড়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়, আমি রান্না করতে করতে শুনবো।

বাবুদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পড়তে দেখে অন্নদার মনে হয়েছে, তাদের কুস্মীই বা পড়াশুনো করবে না কেন? কুস্মীর তো বুদ্ধি কিছু কম নেই।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিদ্রূপের সুরে জয়রাজ বলতো, এ মেয়ে বুঝি আপিসে চাকরি করে খাওয়াবে? দেখবি তখন ফুরুৎ করে পাখি উড়ে যাবে! ওর মাকে দেখলিনি, কেমন পাইলে গেল!

বড় সুখের সময় ছিল তখন। স্কুলে যাবার নাম করে দুপুরবেলায় পার্কটায় গিয়ে খেলতো কুস্মী। স্কুলে পড়ার থেকে খেলাই বেশী। কুস্মী চু-কিত কিত খেলায় এক দমে দু'তিনজনকে আউট করে দিতে পারে, না থেমে একশো বার স্কিপিং করতে পারে। বাবুদের বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে অন্নদা নিয়ে আসতো মাছের কাঁটা কিংবা হঠাৎ পচা মাংস-লুচি। তাতেই যেন অমৃতের স্বাদ। এক-একদিন মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে কুস্মী দেখতো, জয়রাজ ঠাঁই ঠাঁই করে থাপ্পড় মারছে অন্নদাকে, আর অন্নদা বলছে আমি গলায় দড়ি দেবো, আমি মাথা কুটে মরবো, হে ভগবান, এমন মানুষের হাতে আমায় দিলে—। আবার পরদিন সকালেই কিন্তু জয়রাজ আর অন্নদা হেসে হেসে কথা বলতো।

দশ বছর বয়সে কুস্মী যখন ক্লাস থ্রিতে উঠলো, সেই পার্কের কোণের কর্পোরেশান স্কুলটা উঠে গেল। উঠে গেল মানে তো বন্ধ হলো না, অন্য কোনো পাড়ায় সেটা বসলো, রাস্তা সারানোর জন্য ভেঙ্গে ফেলা হলো ঐ পার্কের অর্ধেকটা।

অন্নদা বলেছিল, সে পয়সা দিয়ে বীণাপাণি স্কুলে পড়াবে কুস্মীকে।

তাই শুনে জয়রাজ খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসে

অন্নদার চেয়ে জয়রাজ এই পৃথিবীকে অনেক বেশী দেখেছে, তাই সে অমন বিদ্রূপের হাসি দেবার অধিকার পেয়েছে।

আসলে বীণাপাণি স্কুলেও মেয়েদের পয়সা লাগে না। সরকার দিয়ে দেয়। কিন্তু পয়সা লাগলেও বাবুদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলে ঝিয়ের বাড়ির মেয়ের একসঙ্গে পড়ার অনেক রকম বাধা আছে। প্রথম খুব সাধারণ বাধাই হলো, কুসমীর বয়েস দশ পেরিয়ে এগারো হতে চললো, এই বয়েসী কোনো মেয়েকে ভদ্র স্কুলগুলোর ক্লাস থ্রি-তে ভর্তি করা হয় না। ঠিক ছ' বছরে ক্লাস ওয়ান, সাত বছরে ক্লাস টু এই রকম নিয়মের কড়াকড়ি, তাছাড়া অ্যাডমিশন টেস্টের ফ্যাচাং তো আছেই।

এরপর ভরসা মীর চৌধুরী সাহেব।

মীর মশারফ চৌধুরী নামের একজন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ এই বস্তিতে প্রতি শনিবার আসেন। বছর পঞ্চাশেক বয়েস, মাজা মাজা গায়ের রং, মাঝারি উচ্চতার মানুষ। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেন, গায়ে সাদা শার্ট, মাথায় একটি সাদা টুপি এবং পায়েও সাদা কেডস জুতো। বর্ষার সময়ও তাঁর এই পোশাক। মানুষটি অতি ধীর, স্থির, কথা বলেন মৃদুস্বরে।

এই বস্তিতে থাকে মঙ্গলা আর পশুপতি, তাদের তিনটি বাচ্চা। ওদের দেশ জয়নগর-মজিলপুরে এবং মীর মশারফ চৌধুরী ওদের ধর্মবাপ। এক হিন্দু দম্পতির ধর্মবাপ একজন মুসলমান হয় কী করে, তা ঐ বস্তির মধ্যে গিয়ে কেউ তদন্ত করেনি। বস্তির লোকেরাও সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলে না। মীর সাহেবকে সকলেই শ্রদ্ধা করে।

মীর সাহেব চাকরি করেন একটি সওদাগরি অফিসে, প্রতি শনিবার তিনি দেশে যাওয়ার আগে এখানে দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়ে যান। কেউ কোনো খাদ্যদ্রব্য দিলে তিনি স্পর্শ করেন না। তা বলে যে ছোঁয়াছুঁয়ি মানেন, তাও নয় অবশ্য। সবার কাছে থেকেই পানি চেয়ে খান তিনি। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে। কারুর রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত লেখাতে হলে

সেজন্যে মীর সাহেব আছেন। যার যে-কোনো প্রয়োজনে মীর সাহেব এগিয়ে আসেন দু'চারজন হিন্দুস্থানীও আছে এখানে। তারা মীর সাহেবকে দিয়ে মানিঅর্ডার ফর্ম ভর্তি করিয়ে নেয়। এ ছাড়া বস্তির মধ্যে কখনো গুরুতর ঝগড়াঝাঁটি হলেও সেজন্য মীর সাহেবকে সালিশী মানা হয়। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় দু' পক্ষের কথা শোনেন, কোনো রকম ব্যক্তিত্ব জাহির করেন না, সব শেষে তিনি বলেন, আমার তো মনে হয়, এমন করলেই ভালো হয়—। মীর সাহেব সব সময় ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করে দেন।

আজকাল কেউ কোনো মতলব ছাড়া কোথাও যায়, নিজের স্বার্থ ছাড়া পরের উপকার করে এমন বিশ্বাস করা শক্ত। মীর মশারফ চৌধুরী সাহেব ঠিক কোন মতলব বা উদ্দেশ্য নিয়ে এই বস্তিতে আসেন, তা এখনো পর্যন্ত বোঝা যায় নি। নিছক ভালোমানুষি? হতেও পারে!

শুধু এই বস্তিতে নয়, কাছাকাছি অন্যান্য দু'একটা বস্তি এবং রাজাবাজারের এক মুসলমান বস্তিতেও যান তিনি। সব জায়গাতেই তাঁর কাজ ঐ দরখাস্ত কিংবা মানিঅর্ডার ফর্ম লিখে দেওয়া। পরোপকার করা তাঁর নেশা। মঙ্গলা আর পশুপতিকে একবার নাকি তিনি প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।

অন্নদা এসে মীর সাহেবকে বলেছিল, আপনী কুসুমীর একটা ব্যবস্থা করুন।

বস্তির দু'তিনটি ছেলেকে মীর সাহেব মাঝে মাঝে পড়াশুনো দেখিয়ে দেন। মেয়েরা পড়ে না, কিন্তু এখানকার কিছু ছেলে কিছুদূর পর্যন্ত পড়াশুনো চালিয়ে যায়।

মীর সাহেব সমস্ত স্ত্রীলোককে মাতৃসম্বোধন করেন। তিনি বলেছিলেন, মা, স্কুলে না পড়ে শুধু সপ্তাহে একদিন আমার কাছে পড়লে আর কতটুকু লেখাপড়া শিখবে? তার থেকে বরং এক কাজ করুন।

কী?

ওর তো মা-বাপ নেই বলছেন। লিলুয়ায় একটা অনাথ আশ্রম আছে, সেখানে ওকে ভর্তি করে দেবার চেষ্টা করুন বরং। আমি

দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি। সেখানে ওরা পড়াশুনো শেখায়, হাতের কাজ শেখায়—

অন্নদা রাজি হয়নি। তার ছেলে মেয়ে নেই, কুস্‌মীই তার মেয়ে, তাকে সে অনাথ আশ্রমে পাঠাবে কেন? অনাথ আশ্রমে যায় তো শুধু পোড়াকপালীরা।

না। আপনিই পড়ান ওকে।

কিন্তু মীর সাহেব ঠিকই বলেছিলেন। ওরকমভাবে পড়াশুনো হয় না, কুস্‌মীরও মন নেই তেমন। সপ্তাহে একদিন মীর সাহেব আসেন। বাকি দিনগুলো সে একা একা পড়া তৈরি করবে, পাশেই রাস্তায় যখন সবাই চেঁচিয়ে খেলা করছে। কুস্‌মী বই ছেড়ে পালায় আর অন্নদা তাকে খুঁজে নিয়ে এসে মারে।

মীর সাহেব একদিন অন্নদাকে বললেন, আপনি বরং মেয়ের বিয়ে দিন।

সেদিন মুখঝামটা দিয়ে উঠলেন অন্নদা। বস্তির মেয়েদের মতন এগারো-বারো বছর বয়স হতে-না-হতেই বিয়ে দেওয়া সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তারপর স্বামী যদি ছেড়ে চলে যাক্, অমনি পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়ে এই বস্তিতেই একাধিক। স্বামীরা এককথায় স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, কোনো দায়-দায়িত্বনেই। (আইন-আদালত শুধু বড়লোক আর ভদ্রলোকদের জন্য।)

তাছাড়া বিয়ে দিতে টাকা লাগে। অন্নদার হাতে টাকা নেই। একসময় টাকা জমিয়ে সে কুস্‌মীর খুব ভালো বিয়ে দেবে। প্রতি মাসে সে নগদ একটা টাকা খরচা করে লটারির টিকিট কাটে।

তখন পর্যন্ত বেশ মনের আনন্দে ছিল কুস্‌মী। পড়াশুনোও নেই, তাড়াতাড়ি বিয়েও করতে হলো না। সে গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুরফুরিয়ে হেসে খেলে বেড়ায়। দু'এক বাড়ি থেকে তাকে ঠিকে কাজের জন্য ডেকেছিল, অন্নদা রাজি হয়নি। কুস্‌মীকে সে ঝি বানাবে না। খেয়েদেয়ে কুস্‌মীর স্বাস্থ্য ভালো হতে লাগলো। ঐ স্বাস্থ্যই যে তার শত্রু, তা সে জানবে কী করে।

চোদ্দ বছরের বয়েসের সময় মাছওয়ালা পাঁচু এক রাতের জন্য বাইরে নিয়ে গেল কুস্‌মীকে। মাছও বিক্রি করে, আবার চোলাইয়ের ব্যবসাও করে পাঁচু। বস্তিতে তার বেশ প্রতিপত্তি। তার হাতে সোনার তাগা, সবাই তাকে অল্পবিস্তর ভয় পায়।

কুস্‌মী যখন ফিরলো. তার ঠোঁটে রক্তের দাগ।

পরদিন অন্নদা সেই পাঁচুকে পেয়ে তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করলো, শুধু তাই নয়, রাগের ঝোঁকে শেষ পর্যন্ত পাঁচুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কিল চড় লাগাতে লাগলো পাগলের মতন।

পাঁচু কিন্তু হাসতে হাসতে বললো, আর মাস্‌সী, এত ক্ষেপচো কেন? ওকে আমি যাত্রা পালায় নামাবার জন্য এট্রেনিং দিতে নিয়ে গেস্‌লাম।

অন্নদা কিন্তু কুস্‌মীকে একটুও বকে নি। বরং সেই শনিবার সে পাঁচুর নামে নালিশ জানালো মীর সাহেবের কাছে।

মীর সাহেবের কাছে যে শুনতে আসে, তিনি তাকেই শুধু উপদেশ দেন। নিজে থেকে কারুকে কিছু বলেন না বা নিজে থেকে কোথাও ঝগড়া মেটাতে যান না। পাঁচুর দলবল আছে, পাঁচু তাঁর কথা শুনবে কেন? এখানে মীর সাহেব অসহায়।

তিনি দুঃখিত গলায় বললেন. মা, আপনি এবার মেয়ের বিয়ে দিন. এখন তো বড় হয়েছে···রোটারি ক্লাব শুনেছি এই সব বিয়ের জন্য চাইলে সাহায্য দেয়। আমি দরখাস্ত লিখে দিতে পারি।

মঙ্গলা এবং পশুপতি, যারা মীর সাহেবকে ধর্মবাপ বলে মানে, তারা এই কথা শুনে হাঁ হয়ে যায়। বস্তির মেয়ের বিয়ের জন্য কেলাব থেকে টাকা দেয়? তাদেরও এক মেয়ে ঠিকে-কাজে লেগে গেছে, তারও তো বিয়ে দিতে হবে।

পশুপতি অন্নদাকে বলে, ঐ পাঁচুর সঙ্গেই কুস্‌মীর বিয়ে দিয়ে দাও না, মাসী?

কক্ষনো না! অন্নদা দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে। ওসব নষ্ট-চরিত্রের লোকের সঙ্গে সে কুস্‌মীর বিয়ে দেবে না। কুস্‌মীর জন্য সে কেনো

ভদ্র-সভ্য ছেলে খুঁজে আনবে, যে-ছেলে এরকম কোনো বস্তিতে থাকে না।

সবাইকে উদ্দেশ করে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, আমার কুসমীর দিকে যে নজর দেবে, রক্ত উঠবে তার মুখ দিয়ে, তার ওলাউঠো হবে, মা শেতলার দয়া হবে—

এর পরের বিপদটি এলো বড় অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে। আর কেউ নয়, অন্নদার স্বামী জয়রাজই একদিন বড় অসমীচীন ব্যবহার করে ফেললো। দিনরাত শুয়ে শুয়ে থেকে জয়রাজ তার মস্তিষ্কটাকে একটি শয়তানের কারখানা বানিয়ে তুলেছিল, কুসমীর মতন একজন নধর কুমারীকে দেখে সে আর লোভ সামলাবে কী করে। কুসমী তো তার নিজের রক্তের সন্তান নয়। শরীরে বাতব্যাধি হলেও জয়রাজের মনটা তো শুকিয়ে যায় নি। কুস্‌মী এই ঘরেই শোয়, এখানেই জামা কাপড় ছাড়ে, তাই দেখে জয়রাজের রক্ত গরম হয়। জয়রাজের আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কুসমী যখন ছটফট করছিল, সেই সময় দৃশ্যটা অন্নদার চোখে পড়ে যায়।

এবার কিন্তু অন্নদা তার স্বামীকে মারতে গেল না, কুসমীকেও গালমন্দ দিল না। সে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সুখ চায়নি অন্নদা, স্বস্তি চেয়েছিল। বাবুদের বাড়ির মেয়েদের কেমন সুন্দর যোটক মিলিয়ে বিয়ে হয়। মেয়েরা হাসতে হাসতে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। মাঝে মাঝে ফিরে এসে কতরকম গল্প করে। কুস্‌মীকে সেই রকম একটা সৌভাগ্য দেওয়া যেত না? নিয়তি! নিয়তি!

পরদিন সকালেই সে কুসমীর হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরুলো। ফ্ল্যাট-বাড়িটার তিনতলায় এসে এক যুবতীকে বললো, বৌদি, আপনি লোক খুঁজছিলেন দেখুন, এই মেয়েটাকে যদি পছন্দ হয়। কোনো কাজ জানে না, শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

ফ্ল্যাটটি এক ডাক্তারের। তাঁর স্ত্রীর বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশ, অধিকাংশ আধুনিক পরিবারের মতনই ওঁদের একটিমাত্র সন্তান, আট বছরের। ডাক্তারের স্ত্রীর নাম দীপান্বিতা, সংক্ষেপে দীপা।

দীপার চোখে তার চেনাশুনো, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের ছোট জগৎটা খুব সুন্দর, বাকি সবই ভয়ের। পৃথিবীতে অনেক অচেনা চমৎকার জায়গা আছে বটে কিন্তু অচেনা মানুষ মাত্রেই বিপজ্জনক।

ঠিক এই বয়েসী একটি ছোকরা চাকর একবার এই ফ্ল্যাট থেকে অনেক কিছু চুরি করে পালিয়েছিল। একটা ক্যামেরা, একটা রেডিও, বহু জামাকাপড় এমনকি দুটো রূপোর বাটি পর্যন্ত। ডাক্তার পুলিসে খবর দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দীপা ভয় পেয়ে বলেছিল, না না, যা চুরি গেছে যাক! পুলিস যদি ছেলেটাকে ধরে, তাহলে খুব মারবে নিশ্চয়ই।

ডাক্তার বলেছিলেন, তা তো মারবেই।

যেন নিজের গায়েই মার লাগছে এইভাবে শিউরে উঠে দীপা বলেছিল, ওরে বাবা, ছেলেটাকে মারবে, হয়তো হাত-পা জখম করে দেবে। তারপর আবার জেলেও দেবে ?

চুরি করলে জেল খাটবে না ? অবশ্য যদি ধরা পড়ে !

জেল থেকে ছেলেটা যখন বেরুবে, তখন আমাদের ওপরেই ওর রাগ থাকবে। আমরাই ওর এত ক্ষতি করে দিয়েছি। তখন সেই রাগের চোটে যদি ও আমাদের খুন করতে আসে ? তুমি অনেক রাতে ফেরো, বাবলু রিকশা করে স্কুলে যায়···না না, পুলিসে খবর দেবার কোনো দরকার নেই--

তা বলে অতগুলো দামী দামী জিনিস নিয়ে গেল, ওকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবো ?

কী-ই বা দামী জিনিস। ক্যামেরাটা তো তুমি দু'বছরের মধ্যে একবার ছুঁয়েও দেখো নি, এমনি এমনি পড়ে থাকতো, আর রেডিওটা আমি ভাবছিলাম একসঙ্গে একটা থ্রি ইন ওয়ান কিনবো, তখন ও রেডিওটা কাজে লাগতো না।

আর রূপোর বাটি দুটো ?

আজকাল রূপোর বাটি কেউ ব্যবহার করে নাকি ? গাঁইয়া গাঁইয়া ব্যাপার। বিয়ের সময় দিয়েছিল···এখন শুধু আলমারিতে বোঝাই করে রাখা—

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তোমার মতন সবার এমন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে পুলিসের তো আর কোনো কাজই থাকবে না!

সেই থেকে আর ছেলে-চাকর রাখা হবে না ঠিক হয়েছে।

একজন বয়স্কা মহিলা আছেন, তাঁর ওপরেই রান্নাবান্নার পুরো দায়িত্ব। এ ছাড়া জামা-কাপড় কাচা, দোকানপাট যাওয়ার জন্য আর একজনকে সত্যিই দীপার খুব দরকার।

অন্নদার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগে অনেক কথা জেনে নিয়ে তারপর দীপা জিজ্ঞেস করেছিল কুস্মীকে, ঠিক বাড়ির লোকের মতন থাকতে পারবি তো?

কুস্মী ঘাড় নেড়েছিল।

দীপা প্রথমে একটা নতুন সাবান এনে দিয়েছিল কুস্মীকে।

তারপর একটু ভেবে আবার আলমারি খুলে একটা পুরোনো শাড়ি, পুরোনো ব্রা আর শায়া, ব্লাউজ ইত্যাদিও একটা করে এনে সব তুলে দিল কুস্মীর হাতে। বললো, আমাদের বাড়ির একতলায় মেয়েদের বাথরুম আছে, সেখান থেকে খুব ভালো করে চান করে আয় আগে। পুরোনো জামাকাপড় ফেলে দিয়ে এগুলো পরবি। আমার চটি আছে, তাও দেবো। আর একটা কথা, রাত্রে এখানেই থাকতে হবে, বস্তিটস্তিতে শোওয়া চলবে না। বস্তির নোংরা জামা-কাপড়ে আমার বাড়িতে ঢুকতে দেবো না।

কুস্মী সেদিন বালিকা থেকে যুবতী হলো। বস্তির মেয়েরা চোদ্দ বছর বয়েসেই যুবতী হতে পারে।

অন্নদা আর কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো ব্যাপারটা দেখতে লাগলো। বৌদির দেওয়া জামা-কাপড় পরতেই কেমন চেহারাটা পাল্টে গেল কুস্মীর! ঠিক ভদ্দরলোকদের মতনই দেখাচ্ছে না? শুধু মুখে একটা তেল-তেল ভাব আছে। ভদ্দর-লোকের বাড়ির মেয়েদের মুখ ওরকম হয় না। কিছুদিন থাকলে কুস্মীরও মুখখানা অন্য রকম হবে নিশ্চয়ই।

দীপা একবার যাকে আপন বলে গ্রহণ করে, তার প্রতি তার স্নেহ-দয়া-মায়া-ভালবাসার অন্ত থাকে না। কুস্মীর আর একটুও কষ্ট

রইলো না। কাজও খুব হাল্‌কা, সে কোনো কাজে ভুল করে ফেললে বৌদি বকুনি দেবার বদলে হাসে। এবং বৌদি নিজের সমান মাছের টুকরো তাকে দেয়।

দীপার সংসারে একটিই খুব বড় সমস্যা।

দীপার আট বছরের ছেলে বাবলু কিছুতেই বাংলা পড়তে চায় না।

বাবলু অ-আ ক-খ শেখার ঢের আগে শিখেছে এ বি সি ডি। বাংলা এক দুই এখনো লিখতেই জানে না। যোগ করবার জন্য সে আঙুলের কড় গোনে না, ডগা গোনে। নামতার বদলে মুখস্থ করে টেব্‌লস। পাঁচ-ছ' বছর বয়েস থেকেই সে পড়ে ইংরেজি কমিকস, আটে পা দিয়েই শুরু করলো ইনিড ব্লাইটন। শ্রীমতী ইনিড ব্লাইটনের একটি বই লেখার কারখানা আছে, সেখান থেকে প্রতি মাসে আট-দশখানা বই বেরোয় এবং সুদূর ইওরোপ থেকে এসে সে-সব বই কলকাতার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাগে ঢুকে যায়।

চায়ের টেবিলে ডাক্তার রোজ আফসোস করে বলেন, আট বছর বয়েসে আমি মৌচাক পত্রিকায় ধাঁধার উত্তর পাঠাতাম নিজে চিঠি লিখে। আর বাবলু—এখনো এক লাইন বাংলা সেনটেন্স লিখতে শিখলো না? ওকে সন্দেশ, আনন্দমেলা ধরাও, এখনো বলছি—

ছেলে বাবা-মা'র সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলবে, সুকুমার রায়, শিব্রাম চক্রবর্তীর নামও জানবে না, এ কথা ভেবে দীপারও দুঃখ হয় খুব।

দীপা একগাদা রঙীন বাংলা শিশুসাহিত্য কিনে এনে ছড়িয়ে রাখে সারা বাড়িতে, বাবলুকে আকৃষ্ট করবার জন্য, আর বাবলু পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। যার বর্ণপরিচয় হয়েছে এ বি সি ডি দিয়ে, তার কাছে বাংলা তো বিমাতৃভাষা।

কুস্‌মী তার ক্লাস থ্রি-র বিদ্যে নিয়ে সেইসব বই পড়ে। দুপুরবেলা সারা বাড়ি যখন শুনসান, সেই সময় কুস্‌মী বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে রঙীন ছবির বই পড়তে পড়তে ফিক ফিক করে হাসে।

রাজা মহারাজাদের দিন চলে গেছে, তবুও এখনো এক একটা বাড়িতে তিরিশ জন চাকর, পঁচিশ জন দাসী, তেইশটি রাঁধুনী এবং আঠেরোটি ড্রাইভার থাকে। যেমন এই সব ফ্ল্যাট-বাড়িতে। এই সব চাকর-দাসীদের একটি সঙ্ঘও গড়ে ওঠে। তারা কুস্‌মীকে দেখে চোখ ও নাক বাঁকায়, কারণ দীপা কিছুতেই কুস্‌মীকে ওদের সঙ্গে মিশতে দেবে না। ওদের সঙ্গে মিশলে কুস্‌মী খারাপ কথা শুনবে, আবার কুস্‌মীর মুখ থেকে সেগুলি শিখতে পারে বাবলু। এখানে কাজ করতে গেলে কুস্‌মীকে সারাক্ষণ ফ্ল্যাটের মধ্যেই থাকতে হবে।

অবশ্য কুস্‌মীকে স্নান করতে যেতে হয় একতলায়। দীপার নিজের বাথরুমে ঝি-চাকররা স্নান করবে, একথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

কুস্‌মীর মাসী-দিদা অন্নদা এ বাড়িরই অন্য দুটি ফ্ল্যাটে ঠিকে-কাজ করে, যাবার সময় রোজ সে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কুস্‌মীর সঙ্গে দুটো কথা বলে যায়। প্রথম মাসের মাইনে কুস্‌মী দিতে গিয়েছিল অন্নদাকে, কিন্তু সে নেয়নি। অন্নদা পরামর্শ দিয়েছিল, কুস্‌মী যেন তার টাকা বৌদির কাছে জমা রাখে। পরে কাজে লাগবে।

এইভাবে চোদ্দ থেকে আঠেরোয় উত্তীর্ণ হলো কুস্‌মী।

এর পর তার ক্ষতি করলো একজন মেমসাহেব।

ভালো রকম খেয়েদেয়ে এবং যত্নে কুস্‌মীর স্বাস্থ্যটি দিব্যি খুলেছিল। খাবার টেবিলে ডাক্তারবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ইংরেজিতে কুস্‌মী বিষয়ে আলোচনা করেন। বাবলুকে পড়াতে আসে যে ছোকরা মাস্টারমশাই, সে প্রায়ই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কুস্‌মীর দিকে। বাবলুর পড়ার সময় কুস্‌মী যেন ও-ঘরে না যায়।

দীপা এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি। সে অবাক হয়ে বলে, সে কি! কুস্‌মী তো একবার মাত্র চা দিতে যায় মাস্টারমশাইকে। ছেলেটি এরকম অসভ্য? তাহলে তো ওকে ছাড়িয়ে দিতে হবে!

ডাক্তারবাবু হেসে বলেন, আরে না না, ছেলেটি পড়ায় ভালো, ওকে ছাড়াবে কেন? আজকাল কারুকেই এক কথায় ছাড়িয়ে দিতে নেই, অল্প বয়সে ওরকম একটু হয়ই, তুমি বরং…

এই সময় বাবলু এসে পড়তেই কথা বন্ধ হয়ে যায়। আজকাল এমন মুস্কিল হয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েদের সামনেও ইংরেজিতে গোপন কথা আলোচনা করার উপায় নেই।

ডাক্তারবাবুর এক ভাই জার্মানিতে থাকে, এক মাসের জন্য সে বেড়াতে এলো সস্ত্রীক। জার্মানিতে বাঙালীর ছেলে থাকে, অথচ জার্মান মেয়ে বিয়ে করেনি এমন হয় নাকি? অমিতাভর স্ত্রী মার্থা ভাঙা ভাঙা বাংলা জানে। ওদের একটি চার বছরের মেয়ে আছে।

বাঙালী ছেলে মেম বিয়ে করুক কিংবা বাঙালী মেয়ে সাহেব বিয়ে করুক, তাদের বাচ্চারা কিন্তু ফর্সাই হয় সব সময়। অর্থাৎ কালো রঙের চেয়ে সাদা রঙের জোর বেশী। মাথাভর্তি সোনালী চুল, ঠিক যেন দেবশিশুর মতন দেখতে অমিতাভ-মার্থার মেয়েকে। কিন্তু সে অসম্ভব দুষ্টু এবং এত জোরে কাঁদতে পারে যে তার কান্না যেন স্বর্গের দেবতাদেরও কান ঝালাপালা করে দেয়।

শীতের দেশ থেকে এসে ভারতের মতন দেশে উত্তাপের সামঞ্জস্য করে নিতে তাদের বেশ কিছুদিন সময় লাগে, এবং সেইজন্যই তারা কাঁদে। এবং ঐটুকু মেয়েই বুঝে গেছে যে তার ড্যাডির দেশটি অতিশয় নোংরা। ফ্ল্যাট-বাড়ির সিঁড়ি নোংরা, রাস্তার কুকুর নোংরা, গাড়ি নোংরা।

শিশুটির নাম জার্মানিতে অ্যানা, কলকাতায় পূর্ণা। এ নামের রহস্য আছে। ডাক্তারবাবু এবং অমিতাভর মা-বাবা থাকেন কাশীতে, সেখান থেকেই তাঁরা নাতিনাতনীর নাম ঠিক করে পাঠান। জার্মান পুত্রবধূর সন্তানের নাম তাঁরা রেখেছেন অন্নপূর্ণা। এ রকম একটা সেকেলে ভারী নাম ঐটুকু একটি শিশুর ওপর চাপানো অন্যায়, তাই অমিতাভ সে নামের সংক্ষিপ্ত, আধুনিক রূপ দিয়েছে পূর্ণা। তার স্ত্রী বলে ফ্রুনা। বাবার দেশে তাকে ঐ নামে ডাকা হয়, মায়ের দেশে সে আবার অ্যানা হয়ে যাবে। দুই নামের গণ্ডগোলে বেচারি বিপর্যস্ত।

বাবলুর সঙ্গে পূর্ণার অতি সামান্য কারণে ঝগড়া লাগে এবং যখন তখন সে কেঁদে ওঠে। ডাক্তার ও দীপার অতি প্রিয় সন্তান বাবলু

ইদানীং একটু বেশী বকুনি খাচ্ছে। পূর্ণা কেঁদে উঠলে তাকে থামায় কার সাধ্য! একদিন কুস্মী তাকে কোলে নিয়ে অ-য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাবো পেড়ে, এই ছড়া শুনিয়েছিল এবং সামনের পার্কে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখন পূর্ণা একটুও কাঁদে নি।

তারপর থেকে কুস্মী পূর্ণাকে প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, অন্য অসময়ে পূর্ণা কেঁদে উঠলে মার্থা মিনতিমাখা স্বরে বলে, খুস্মী প্লিস, ফূরনাকে একটু পার্কে স্ট্রল করিয়ে এসো!

পূর্ণাকে কোলে করা অবস্থায় কুস্মী পার্কে রীতিমতন একটু দর্শনীয় বস্তু হয়ে ওঠে। হবে না? কুস্মীর গায়ের রং কুচকুচে কালো, আর তার কোলের শিশুটির গায়ের রং দুধে-আলতা, মাথার চুল নরম আগুনের শিখার মতন। এবং সে যখন বাংলায় বলে, খুস্মী, ওডিকে ওডিকে—তখন কী মিষ্টিই শোনায়!

পার্কের অনেকেই শিশুটিকে আদর করতে আসে। কিন্তু মার্থার কঠোর নির্দেশ, বাইরের কোনো লোক যেন পূর্ণার গায়ে হাত না দেয়। (বাঙালীদের একটা বাজে অভ্যেস আছে, ফুটফুটে শিশু দেখলেই গাল টিপে আদর করা। হাতে যে কত রকম জার্ম থাকে, সে খেয়াল নেই।)

বাচ্চাটিকে আদর করতে এসে আঁটোসাঁটো গড়নের নবোদ্গত-যৌবনা কুস্মীকেও অনেকে খুব কাছ থেকে দেখে নেয়।

পূর্ণাকে নিয়ে এখন আর মার্থা-অমিতাভদের কোনো সমস্যা নেই। তারা সিনেমা বা রাত্রের ককটেল-পার্টিতে গেলেও তাদের মেয়ে কুস্মীর কাছে দিব্যি থাকে। কুস্মীর কাছ থেকে পূর্ণা বাংলা শিখছে। সে 'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে' ছড়াটি আধো আধো গলায় বলতে পারে এবং তা শুনে ফ্ল্যাট-বাড়ির অনেকেই চমৎকৃত। (সাহেব জাতির মুখে বাংলা শুনলে পুলকিত হয় না এমন বাঙালী ক'জন আছে!)

দীপাও কুস্মীকে অন্য সব কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে শুধু পূর্ণার

দেখাশুনোর ভার দিয়েছে। কুসুমী এখন পূর্ণার সব সময়ের আয়া।

কৃতজ্ঞ মার্থা নিজের গায়ের একটা ঈষৎ ফ্যাঁসা ব্লাউজ কুসুমীকে উপহার দিয়ে দিল।

একেই বলে মেমসাহেবদের কাণ্ডজ্ঞান! জার্মানিতে তৈরি ব্লাউজ কি কলকাতার বাড়ির ঝির অঙ্গে মানায়? সে এক বিসদৃশ ব্যাপার। দীপাই বা কী করবে, তাকে জিজ্ঞেস না করেই মার্থা ব্লাউজটা দিয়ে দিয়েছে, এখন তো আর ফেরত দেওয়া যায় না! আর নতুন পোশাক পেলে কোন্ মেয়েই পরতে না চায় তক্ষুনি?

সুতো নয়, কৃত্রিম কাপড়ের তৈরী সাদা রঙের ব্লাউজ, গলার কাছে গোল করে কুচি দেওয়া। (যতদূর ছবি দেখে মনে হয়, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথও এই ধরনের একটা ব্লাউজ পরেন।)

সেই জামা গায়ে কুসুমীর রূপ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। দীপার দেওয়া একটা লালরঙের ফুল-ফুল ছাপাশাড়ি, তার সঙ্গে ঐ রানী-রানী জামা, কুসুমী গর্বিতভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটে। তার মুখে যেন একটা অন্যরকম আলো এসেছে।

পূর্ণাকে নিয়ে কুসুমী যখন যোগানন্দ স্বামীর নব প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরের সামনে দাঁড়ায়, তখন পুরুষ-ভক্তরা অনেকেই কালীমূর্তি থেকে চোখ ফিরিয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকে কুসুমীর দিকে।

কুসুমী এখন সাবান মেখে স্নান করে। দীপা বৌদিকে দেখে সে সপ্তাহে একদিন মাথা ঘষতে শিখেছে, সেই দিনটি তার চুল ফুলে ফেঁপে সমস্ত পিঠ ছড়িয়ে থাকে। জার্মান মেমসাহেবের লো-কাট ব্লাউজ পরার ফলে তার বাতাবী লেবুর মতন স্তন অনেকখানি দেখা যায়। বাবলুর মাস্টারমশাই এখন ঘন ঘন তাকায় কুসুমীর দিকে। এমন কি একদিন স্বয়ং ডাক্তারবাবু উপলব্ধি করলেন যে এই কিছুক্ষণ তিনি অন্যমনস্ক ভাবে ছুরি দিয়ে কাটা মাখনের মতন কুসুমীর মসৃণ কোমরের দিকে চেয়ে ছিলেন। আরে ছি ছি!

তারপর সংক্ষিপ্ত শীতঋতুর মতন একসময় ডাক্তারবাবু-দীপার সংসারে অমিতাভ-মার্থা-পূর্ণা পর্ব শেষ হয়ে যায়। তারা আবার ফিরে যায় জার্মানি। যাবার সময় পূর্ণার কান্নাকাটিতে কুসুমীকে

এয়ারপোর্ট পর্যন্ত সঙ্গে যেতে হয়েছিল। ডাক্তারবাবু এখনো বলেন যে প্লেন আকাশে ওড়বার পরও প্লেনের আওয়াজ ছাপিয়ে তিনি পূর্ণার কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। ও মেয়েকে জার্মানিতে কে সামলায় কে জানে! সেখানে তো এত শস্তায় ঝি পাওয়া যায় না!

এর পর থেকে কুস্‌মী দোকানে কোনো জিনিস কিনতে গেলে একটু দেরি করে ফেরে। দীপা সেটা লক্ষ্য করে নি প্রথমে, কিন্তু বয়স্কা রাঁধুনীটির কাছ থেকে একদিন তাঁকে অনুযোগ শুনতে হলো। উনুনে ডাল চাপিয়ে কুস্‌মীকে পাঁচফোড়ন আনতে পাঠানো হয়েছিল দু'পা বাড়ালেই মুদির দোকান, কিন্তু কুস্‌মী এসেছে ঠিক এক ঘণ্টা পরে।

দীপার ভুরু উঁচু হয়ে গেল। এসব তো ভালো কথা নয়।

কোথায় ছিলি কুস্‌মী?

মন্দিরে পূজো হচ্ছিল দেখছিলাম।

পূজো দেখার ব্যাপারে ঝি-চাকরদেরও নিষেধ করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে দীপা একটু দ্বিধায় পড়লো। দীপার মনে ভক্তি-ভাব আছে।

আবার আর একদিন দেরি হতেই দীপা চেপে ধরলো। এ সময় পূজো হবার তো কথা নয়। কুস্‌মী সঠিক উত্তর না দিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলো।

বড় মন খারাপ হয়ে গেল দীপার। এত ভালো ব্যবহার করেও এই প্রতিফল!

অন্নদাকে ডেকে দীপা জেরা করে, ঠিক করে বলো, বস্তিতে তোমার কাছে কুস্‌মী যায়?

অন্নদা আতঙ্কিত ভাবে বলে, আমি কিরে কেটে বলছি তোমায় বৌদি, একদিনও যায় না, আমি নিজেই বারণ করিছি, তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো—

তাহলে কোথায় যায় ও? জিজ্ঞেস করলে কিছু উত্তর দেয় না।

কী জানি, বৌদি? তোমার কাছে ওকে দিয়ে নিশ্চিন্দি ছিলাম। একবার ডেকে দাও তো, দু'ঘা মুখে মারি।

এ কথা আর বেশীদিন গোপন রইলো না যে উল্টো দিকে তিনখানা বাড়ি পরে যে একজন মাড়োয়ারীর বিশাল বাড়ি, সেই বাড়িতে এক বাঙালী ড্রাইভারের সঙ্গে কুস্‌মীর ঘোরতর প্রেম চলছে।

দীপা ঠিক করে ফেলে যে, কুস্‌মীকে আর রাখা হবে না। ডাক্তারবাবু অবশ্য উদারমনস্ক। তিনি সব শুনে বলেন ঝি-চাকরের মরাল গার্জেন হতে কে বলেছে তোমাকে? কাজকর্ম ঠিকমতন করে কিনা, সেটাই আসল ব্যাপার। অবশ্য প্রেমে পড়লে একটু আধটু কাজে ফাঁকি দেবেই, সেটুকু ক্ষমা করা যায়।

দীপা ঠোঁট কুঁচকে বলে, ওর হাতের ছোঁয়া কিছু খেতে হবে, ভাবলে আমার ঘেন্না করে এখন।

ডাক্তারবাবু বলেন, প্রেমে পড়াটা ঘেন্নার ব্যাপার? উনিশ বছর বয়সে তুমি সিদ্ধার্থর প্রেমে পড়ো নি?

সিদ্ধার্থ বহুকাল ধরে বিলেতে আছে, তবু তার কথা তুলে এখনো মাঝে মাঝে—ডাক্তারবাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কৌতুক করেন।

অন্নদা এসে কুস্‌মীকে শুধু মারতে বাকি রাখে, বকুনির চোটেই প্রায় তার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে দেয়। কুস্‌মী কথার উত্তর না দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে গোঁজ হয়ে।

ভদ্রবাড়িতে ঝি-চাকরদের এরকম চ্যাঁচামেচি দীপার একদম পছন্দ নয়, তাই সে অন্নদাকে বলে, তুমি অন্য কিছু ব্যবস্থা করো।

ডাক্তারবাবু একটি সমাধান-প্রস্তাব দেন। ঐ ড্রাইভার ছেলেটির সঙ্গে কুস্‌মীর বিয়ে দিলে কেমন হয়? তাহলেই আর ব্যাপারটা অবৈধ থাকে না।

ছেলেটির নাম সুখেন। বয়সে পঁচিশ-ছাব্বিশ, স্বভাবটা গম্ভীর ধরনের। দেখলে খারাপ বলে মনে হয় না। মাইনে সে ভালোই পায়। কারণ সে ভালো জামাকাপড় পরে। কুস্‌মীর চেহারা দেখে কিংবা কুস্‌মীর গায়ে ঐ জার্মান ব্লাউজ দেখে কুস্‌মীকে তার পছন্দ হয়েছে, তা বলা শক্ত। তবে ঐ ব্লাউজটা আজকাল কুস্‌মী খুলতেই চায় না।

ছেলেটি বিয়ে করতে রাজি। ড্রাইভার-শ্রেণীর সঙ্গে সচরাচর

ঝি-শ্রেণীর বিবাহ সম্পর্ক হয় না। সুতরাং ছেলেটিকে উদার মনোভাব সম্পন্ন বলতে হবে।

অন্নদা তবু পছন্দ করতে পারে না সুখেনকে। যদিও অন্নদার অপছন্দের কোনো যুক্তিই নেই। সুখেন বস্তিতে থাকে না, মাড়োয়ারী বাড়িতে ড্রাইভারদের জন্য পাকা কোয়ার্টার আছে। আজকাল ড্রাইভারদের ভদ্রশ্রেণীতেই গণ্য করা উচিত। অনেক বাড়িতে ড্রাইভারদের আপনি বলে সম্বোধন করা হয়। মাড়োয়ারীরা অবশ্য তুম্-ই বলে এখনো, কিন্তু সুখেন তো আর চিরকাল মাড়োয়ারি বাড়িতে ড্রাইভারি করবে না। সে চেষ্টা করছে স্টেট বাসে ঢোকার। স্টেট বাসের ড্রাইভারদের কেউ তুমি বলতে পারবে?

অন্নদার তবু ভয় হয়। ছেলেটি অজ্ঞাতকুলশীল। ওর যে অন্য কোথাও আর একটি বিয়ে করা বউ নেই, তা কে বলতে পারে? কুসমীর মাকে একজন ড্রাইভার ধরে নিয়ে গেছে, এমন গুজব আছে। সেই কারণে অন্নদা আর কোনো ড্রাইভারকেই সুনজরে দেখে না। মেয়েটা কিনা শেষ পর্যন্ত এক ড্রাইভারের কাছেই মাথা মুড়োলো!

সুখেন অবশ্য জানিয়েছে যে লক্ষ্মীকান্তপুরে তার বাড়ী আছে। বিয়ের পর তার স্ত্রীকে সে ঝি-এর কাজ করতে দেবে না, তাকে সে দেশের বাড়িতে রেখে আসবে। মাসে একবার সে বাড়ি যায়।

সেই সময় ফুটপাথের কালীমন্দিরের পূজারী যোগানন্দ আচার্যর সবেমাত্র খুব নামডাক ছড়াচ্ছে!

কায়রোর কাছে এক বিমান দুর্ঘটনা হয়, যাত্রীরা সবাই নিহত, সংবাদপত্রে বেরুলো যে তাদের মধ্যে একজন মাত্র ছিল ভারতীয়, তার নাম এ কে দত্ত। সকালবেলা একজন প্রৌঢ় লোক মন্দিরের কালীমন্দিরের সামনে হাউ হাউ করে কেঁদে পড়লো।

যোগানন্দ স্বামী সারারাত জেগে, সকালবেলা একবার মায়ের পুজো সেরে ঠিক দশটার সময় শুতে যান। দশটা থেকে পাঁচটা তাঁর ঘুমের সময়। সে সময় কেউ তাঁর দর্শন পাবে না, কেউ তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। একসময় তিনি দশটা-পাঁচটা

অফিসে কাজ করতেন, সেই স্মৃতিটা তিনি তাঁর জীবন থেকে মুছে ফেলতে চান।

সকালবেলা আহার সেরে তিনি সবে ঘুমোবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় ঐ লোকটির কান্না শুনে তিনি বিরক্ত বোধ করলেন।

(সাধক-সন্ন্যাসীদের অধিকার আছে সকলকে তুই বলার। তাতে তাঁদের সর্বত্যাগী ভাবটা বেশী ফুটে ওঠে।) যোগানন্দ শুধু মেয়েদের বলেন তুই, পুরুষদের বলেন না।

আপনি এই সকালবেলা কান্নাকাটি করতেছেন কেন? মায়ের কাছে কিছু চাবার থাকলে রাত্রে এসে চাইবেন।

বাবা, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে!

কী হয়েছে আপনার ছেলের? কত বড় ছেলে?

এরোপ্লেন দুর্ঘটনায়···আমার বড় ছেলে ··ওহ, ওহ, মা, তোমার মনে এই ছিল? চিরকাল ভক্তিভরে তোমার পূজো দিয়িচি, সেবার আমার বোয়ের অসুখের সময় পাঁঠা মানৎ করিছিলুম, কশবা থেকে এনেছিলুম এগারো কে. জির পাঁঠা ··এখন আমি কী করে···ছেলের মা এখনো জানে না।···

আপনার ছেলে মিশরে চাকরি করে?

কান্না থামিয়ে দারুণ চমকে উঠে ভদ্রলোক প্রকাণ্ড বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন যোগানন্দের দিকে। এই লোকটি কি অন্তর্যামী? তাঁর ছেলের কথা ইনি জানলেন কী করে?

কালীমন্দিরের পূজারীও যে নিয়মিত খবরের কাগজ পাঠ করতে পারে, সে সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা নেই।

হ্যাঁ বাবা, সে মিশরে ভারতীয় দূতাবাসে···আপনি জানলেন কী করে?

· কিছু হয়নি আপনার ছেলের। বাড়ি যান।

আমার ছেলের নাম অরুণ। অরুণকুমার দত্ত। কাগজে বেরিয়েছে তার নাম।

আমি বলছি তো তার কিছু হয় নাই। যে মারা গেছে সে অন্য লোক, পাঞ্জাবীদের মধ্যেও দত্ত আছে।

মিশরেই দুর্ঘটনা হয়েছে···আমার ছেলে সেখানে···

বাড়ি যান, মাথা ঠাণ্ডা করুন, বাড়ি গিয়ে দেখুন আপনার স্ত্রী বা অন্য কেউ কান্নাকাটি করছে কিনা। তাদের বোঝান যে আপনার ছেলের কিছু হয় নাই।

পরদিনই কায়রো থেকে টেলিগ্রাম এলো। অরুণ দত্ত তার পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য তার বেঁচে থাকার খবর জানিয়েছে। প্যাসেঞ্জার লিস্টে তার নাম ছিল ঠিকই কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে তার যাত্রা স্থগিত রেখেছিল।

আগুনের মতন ছড়িয়ে পড়লো এই সংবাদ। বিপ্লবী বারীণ ঘোষ স্ট্রীটের কালীবাড়ির সাধকটি সর্বজ্ঞ। তাঁর কথায় মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগলো সেখানে, তাদের হাজার রকম সমস্যা নিয়ে। (বেশীর ভাগ মানুষই নিজের মনের ভার নিজে একা বইতে পারে না। অন্য কারুর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়।)

সেই ভদ্রলোক মন্দিরের সামনে নিজ ব্যয়ে একটি টিউবওয়েল বসিয়ে দিলেন।

অন্নদা তার মেয়ে ও সুখেনকে নিয়ে এলো যোগানন্দ স্বামীর কাছে। এর আগে কোনোদিন সে কিছু চাইতে আসে নি।

বাবা, আমার মেয়ের বিয়ে দেবো এই ছেলেটির সঙ্গে। আপনি আশীর্বাদ করুন।

যোগানন্দ তীব্র দৃষ্টিতে পর্যায়ক্রমে কুসমী ও সুখেনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

যেন তিনি একজন বিচারক, সুখেন আর কুসমী নামে দুই পাপী বসে আছে তাঁর সামনে। একটাও প্রশ্ন করলেন না তিনি ওদের, তাঁর ঠোঁট নড়তে লাগলো, যেন তিনি নিজের সঙ্গে নিজে কিছু কথা বলছেন।

তারপর কুসমী ও সুখেনকে স্তম্ভিত করে যোগানন্দ বললেন অন্নদাকে, এখন তোর মেয়ের বিয়ে দিস না। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুখেন ঠোঁট ওল্টালো। সব সময় চা খায়, সিগারেট খায়, এ আবার কী রকম সন্ন্যাসী! মেয়েছেলেরা হুজুগে মাততে পারে, কিন্তু আমার এসবে বিশ্বাস নেই। কুসমীর চোখ সেই যে বিস্ফারিত হয়েছে, এখনো সেই অবস্থা!

অমঙ্গলের আশঙ্কায় অন্নদার বুক দুরু দুরু করে। সাধক-ঠাকুর ও-কথা বললেন কেন? সুখেনকে তাঁর পছন্দ হয় নি? কিন্তু কুসমী যে ঐ ছেলেটার সঙ্গে মিশবেই। ছেলেটা ওকে কী দিয়ে বশ করেছে কে জানে?

শনিবার সে মীর সাহেবের কাছে কেঁদে পড়লো।

মীর সাহেব বললেন, আপনি কাঁদবেন না, মা। পূজারী-ঠাকুর নিশ্চয়ই কিছু ভেবে এখন বিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন না। পাত্র তো ঠিক হয়ে রইলোই—

তবু এক মাসের বেশী আর অপেক্ষা করা গেল না। দীপা আর কিছুতেই কুসমীকে রাখবে না, কুসমী দারুণ অবাধ্য হয়ে উঠেছে. একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে রাত এগারোটায় ফিরেছিল।

যৌবন বড় অবাধ্য, বড় যুক্তিহীন। কুসমী নিজের ভালো কিছুতেই বুঝতে চায় না। সারাদিনে একবার অন্তত সে সুখেনের কাছে ছুটে যাবেই।

চাকরি ছাড়িয়ে কুসমীকে বস্তিতেও ফিরিয়ে আনতে চায় না অন্নদা। ঐ বয়েসী মেয়ের ওপর বস্তির সব পুরুষই নজর দেবে। মাছওয়ালা পাঁচুও আরও দু'একবার সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছে। আর অন্নদার তো সবচেয়ে বেশী ভয় তার নিজের স্বামীকে।

মীর সাহেব তাঁর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে শনিবারের বদলে উপস্থিত হলেন এক সোমবারে। অন্নদাকে ডাকিয়ে এনে বললেন, আমি নিজে লক্ষ্মীকান্তপুরে গিয়ে খবর নিয়েছি, মা। ছেলেটি যা বলেছে তা সবই সত্যি। ওদের নিজেদের বাড়ি আছে, কয়েক বিঘে ধানজমি আছে, মা-ভাই-বোন আছে। পরিবারের লোকজনের

বেশ আদব-সহবৎ আছে। ও ছেলে আগে বিয়ে করে নি। পাত্র হিসেবে সুখেন বেশ ভালো।

মীর সাহেবের দিকে অন্নদা কৃতজ্ঞ চোখে তাকায়। তার নিজের স্বামী তো অকর্মার ঢেঁকি। সে নিজে মেয়েছেলে হয়ে আর কত দিক সামলাবে? মীর সাহেব নিজে খরচ করে এবং গরজ করে লক্ষ্মীকান্তপুর গিয়ে সব খবর নিয়ে এসেছেন। পরের জন্য এতখানি কজন করে?

দীপাকে গিয়ে অন্নদা অনুনয় করে বললো, ওর বিয়ের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে এনেছি, বৌদি। সে-কটা দিন কুস্‌মীকে আপনার কাছেই রাখুন।

বিয়ের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দেখালেন ডাক্তারবাবু। কুস্‌মীর বিয়ে বস্তিতে না হয়ে এই ফ্ল্যাটবাড়িতেই হোক না। ঝি-চাকররা এ-বাড়ির জন্য এত খাটে, তাদের বিয়ে দেবার দায়িত্ব তো বাবুদেরই!

দীপার আপত্তি নেই। কুস্‌মীর প্রতি তার মায়া পড়ে গিয়েছিল, কুস্‌মীর ভালোভাবে বিয়ে হলে সে খুশী হবে। জার্মানী থেকে পর পর দুটি চিঠিতে মার্থা কুস্‌মীর কথা লিখেছিল। পূর্ণা দু'তিন মাস ধরে বলতো কুস্‌মীর কথা। এখনো সে বাংলা ছড়াটা ভোলে নি।

ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদ বারোয়ারি। ব্যবহার করতে গেলে অন্যদের অনুমতি নিতে হয়। রবিবার সকালে কো-অপারেটিভের মিটিং-এ ডাক্তারবাবু প্রসঙ্গটি তুললেন। এই অভিনব প্রস্তাবে মধ্যবিত্ত বাঙালীদের মধ্যে আকস্মিকভাবে একটা সাড়া পড়ে গেল, ছুটির দিনে তাশ খেলা কিংবা বীয়ার-পানের আসরে এটা হলো বেশ একটা মুখরোচক আলোচনার বিষয়। এই মহৎ দৃষ্টান্তটি স্থাপন করার ব্যাপারে সকলেই অংশগ্রহণ করতে চান। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সকলে এই বিয়েতে দশ টাকা করে চাঁদা দিতে রাজি হয়ে গেলেন।

কুস্‌মীর বিয়ে হলো বেশ ধুমধাম করেই। দীপা একাই দিল একখানা নতুন ও তিনখানা পুরোনো শাড়ি। এই বাড়ির একটি ফ্ল্যাটের মালিকের শোনপাপড়ির ব্যবসা আছে, তিনি দিলেন কুড়ি

কিলো শোনপাপড়ি। ঝিয়ের বিয়েতে বাবুদের নেমন্তন্ন খাওয়ার কথা আগে কখনো শোনা যায় নি। তরুণ রিপোর্টার বিশ্বদেব এই খবরটা রসালো ভাবে, সংক্ষিপ্ত আকারে ছাপিয়ে দিল তাদের কাগজে।

যোগানন্দ স্বামীর কাছ থেকে আর আশীর্বাদ চাইতে যাওয়া হয় নি। অন্নদাদেরই বস্তির একটি ছোট ছেলের টাইফয়েড হয়েছিল, তার মা তার জন্য ওষুধ এনেছিল যোগানন্দর কাছ থেকে। ছেলেটি বাঁচে নি। অন্নদার ভক্তি চটে গেছে।

বিয়ের পরদিনই সুখেন তার স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল দেশের বাড়িতে। মাড়োয়ারীর বাড়ির অন্য একজন ড্রাইভার গাড়িতে করে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে এলো সস্ত্রীক সুখেনকে। বিদায় দেবার সময় অন্নদা একটুও কাঁদে নি। আজ তো তার পরম সুখের দিন।

পরের সপ্তাহে বউকে রেখে একা ফিরে এলো সুখেন।

অন্নদা তার কাছে কুস্মীর কুশল সংবাদ নিতে গেলে সে প্রায় মুখঝামটা দিয়ে উত্তর দেয়, ভালো থাকবে না কি খারাপ থাকবে? অর্থাৎ সুখেন বুঝিয়ে দিতে চায় যে বস্তীর মেয়ে কুস্মী একটা গ্রামে গিয়ে গৃহস্থবাড়ির বউ হয়েছে, এই তার যথেষ্ট ভাগ্য।

শাশুড়ীর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে চায় না সুখেন। অন্নদাকে সে এড়িয়ে চলে। বস্তীর সঙ্গে কোনো সংস্রবই তার পছন্দ নয়। এবং দু'মাস বাদে সে মাড়োয়ারীর বাড়ির চাকরি ছেড়ে এ পাড়া থেকে চলে গেল। যাবার আগে একজনের সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে মারামারি হওয়ায় সে এ পাড়ায় আর আসেই না।

সুখেন স্টেট বাসে চাকরি পেয়েছে। রাস্তা দিয়ে চলন্ত একতলা, দোতলা বাস দেখলেই অন্নদা সেদিকে খুব ব্যাকুলভাবে তাকায়, যদি দেখতে পায় সুখেনকে ড্রাইভারের আসনে। এ পর্যন্ত একদিনও দেখে নি।

কুস্মীকে জোরজার করে তবু যা হোক দু'তিন কেলাস ইস্কুলে পড়াবার সুফল এখন বুঝতে পারে অন্নদা। কুস্মী চিঠি লিখতে জানে। মাঝে মাঝে সে অন্নদাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লেখে, বড় বড়

গোটা গোটা অক্ষরে, কপিয়িং পেন্সিলে। মীর সাহেব সে চিঠি পড়ে দেন।

এক চিঠিতে কুসমী জানালো যে আগের সপ্তাহে সে নির্বিঘ্নে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। ছেলের গায়ের রং বেশ ফর্সা, তার বাবার মতন।

অন্নদা হিসেব করে দেখে যে কুসমীর ছেলেটি জন্মেছে তার বিয়ের ঠিক সাত মাস কুড়ি দিন পর।

অন্নদার সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে। সে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানায়।

যাক, খুব সাজ্ঘাতিক একটা বিপদ ভালোয় ভালোয় পার হওয়া গেছে। এখন ওরা সুখে বেঁচে-বর্তে থাকুক, তা হলেই হলো।

॥ ৩ ॥

একটু রাত্রের দিকে আসে ছোটেলাট।

আগে তার অন্য একটা কিছু নাম ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন সমবয়েসীরা কিংবা বয়স্করা তাকে ঐ নামেই ডাকে। আর কম বয়েসীরা বলে গুরু। (ফিলমের উত্তমকুমার থেকে শুরু করে পাড়াতে মাস্তান পর্যন্ত সবাই আজকাল গুরু।)

মাথার চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা, একবার পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পর থেকে সে আর বড় চুল রাখে না। মারবার সময় পুলিসরা প্রথমেই মাথার চুল খামচে ধরে।

চকচকে নাইলনের প্যাণ্ট, নাইলনের ফুল শার্ট, কোমরের বেল্টে ইংরেজিতে লেখা লাভ। সেই পোশাকেই ছোটেলাট ফুটপাথে বসে পড়ে ডাকে, এই হেবো, এই ধানু, শালারা ঘুমোচ্ছিস মড়ার মতন! ওঠ্। পোঙায় লাথ কষাবো?

রাত দুটো। হেবো, ধানুরা তাশ খেলা শেষ করে সদ্য ঘুমিয়েছিল, ডাক শুনে উঠে এসে ছোটেলাটকে ঘিরে বসে।

পকেট থেকে দামী, কিং সাইজের সিগারেটের প্যাকেট বার করে ছোটেলাট সবাইকে বিলোয়। সিগারেটের ব্যাপারে সে

খুব উদার! কিন্তু অন্য পকেট থেকে সে যে রামের পাঁইটটা বার করে, তার ভাগ সে কারুকে দেবে না।

এক গেলাস পানি লিয়ায় তো। একদম্ থক্ গিয়া শালা! ইতনা চকিবাজি কিয়া—

ছোটেলাট চোদ্দ পুরুষের বাঙালী। কিন্তু মাস্তানি করতে গেলে মাঝে মাঝে হিন্দী না বললে ঠিক গুরুত্ব আসে না।

অবশ্য ছোটেলাটকে মাস্তান বললে খুবই অপমান করা হবে। সে রেলের কাজ করে। পাড়ার মোড়ে-দাঁড়ানো মেয়েদের দেখলে শিস দেওয়া মাস্তানরা কিংবা খেলার মাঠে যারা গুণ্ডামি করে কিংবা পার্কে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ওপর যারা হামলা করে তারা ছোটেলাটের কাছে পিঁপড়ের সমান। উনত্রিশ বছর বয়েসে সে স্বনামখ্যাত. পুলিস তাকে একডাকে চেনে।

বজবজের লাইনে মালগাড়ি গভীর রাতে মাঠের মাঝখানে থেমে যায়। ড্রাইভার তিনবার তিনবার করে সিটি বাজায়। একদল ছায়ামূর্তি প্রায় চোখের নিমেষে কয়েকটি ওয়াগন সাফ্ করে নিয়ে যায়। ছোটেলাট তাদের নেতা। তার কাছে সব সময় রিভলবার থাকে। যে-জন্য একা-দোকা পুলিস ছোটেলাটকে কোথাও দেখতে পেলেও ধরতে সাহস পায় না।

ধান্নু একটা মাটির গেলাসে করে টিউবওয়েল থেকে জল এনে দিল।

যোগানন্দ প্রত্যেকদিন ভক্তদের দেখা দেন না। মাঝে মাঝে তিনি মৌনী হয়ে যান। ভক্তরা দু'দিন ধরে কালীমন্দিরের সামনে ধরনা দেয়। তারা চিঁড়েগুড় সঙ্গে আনে, আর মাটির হাঁড়ি গেলাস। সেই জন্য এখানে মাটির গেলাসের অভাব নেই।

ছোটেলাট জলভর্তি গেলাসটা রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে বলে, শালা! হামকো ঝুটা গিলাসমে পানি পিলাতা? কাচের গেলাস লিয়ায়!

গুরু, কাচের গেলাস কোথায় পাবো?

কিনে আন্!

এখন কোথায় দোকান খোলা ?

দোকান ভেঙে লিয়ায় ! জগা ওর দোকানের মধ্যেই ঘুমোয় না ? লাথ্ মেরে জগাকে তোল্।

ধান্নু আর হেবো সত্যি সত্যি জগার দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই ছোটেলাট ডেকে বললো, এই শোন্, চেপে যা। জগাকে এখন ডিসটার্ব করার দরকার নেই, আর কোনো জায়গা সে একঠো গিলাস ঢুঁড়ে আনতে পারিস না !

লাথি মেরে জগার দোকান ভাঙা নিছক কথার কথা। এত ছোট ব্যাপারে যে সোরগোল পাকাতে নেই, সে বুদ্ধি ছোটেলাটের আছে। নইলে সে আর এত বড় নেতা হয়েছে কেন ?

গুরু, কুস্মীর কাছে টিনের গেলাস আছে। ও বড় টেঁটিয়া। ও দেবে না !

কে দেবে না ? এই কুস্মী ? কুস্মী, গেলাস দে !

কুস্মী দেয়ালে ভর দিয়ে ঘুমোয়। পা দুটো সামনে ছড়ানো। সে শুতে পারে না। শুয়ে ঘুমোলে, ঘুমের ঘোরে একবার পাশ ফিরলেই তার পায়ে সাজ্ঘাতিক ব্যথা লাগে।

ডাকাডাকিতে কুস্মী সাড়া দেয় না।

ছোটেলাট একটা ছোট ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে কুস্মীকে ছুঁড়ে মারে। আগেই যথেষ্ট নেশা করেছে বলে তার টিপ ঠিক নেই।

উঠে গিয়ে সে কুস্মীর চুল ধরে নেড়ে বলে, আরে কুস্মী, ঢং করছিস শালী ?

কুস্মী ক্রুদ্ধ বনবিড়ালীর মতন ফোঁস করে ওঠে। ছোটেলাটকে এক ধাক্কা দিয়ে সে বলে, দূর হ, হারামীর বাচ্চা!

এবার ছোটেলাট তার গালে একটা চড় কষায় এবং কুস্মী তার হাত কামড়ে দেবার চেষ্টা করে।

ধান্নু এই ফাঁকে কুস্মীর পুঁটুলি থেকে গেলাসটা বার করে নিয়ে দৌড়ে পালায়।

ছোটেলাট বলে, একদিন তুলে লিয়ে যাবো তোকে। কুঠী রেণ্ডী কাঁহিকা।

কুস্‌মীও গালাগালির বন্যা বইয়ে দেয়। গায়ের জোরে না পারলেও ছোটেলাটকে সে তোয়াক্কা করে না।

কুস্‌মীর গেলাসে জল ভরে এনে খান্নু বলে, এই লাও গুরু।

ছোটেলাট আগেকার জায়গায় ফিরে এসে বসে। একটা পুলিসের গাড়ি চলে যায় রাস্তা দিয়ে। ওরা জানে ঐ গাড়ি এখানে থামবে না। মন্দিরে পুলিসদের আসতে নেই।

ছোটেলাট রামে জল মেশায় না। বোতল থেকে কাঁচা রাম এক এক চুমুক গলায় দেয়, তারপর গেলাস থেকে একটু একটু জল খায়।

গুরু, খোকনা কোথায়?

ছোটেলাট প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে বলে, চোপ!

রাত্রির নিস্তব্ধতা সেই আওয়াজে ঝনঝন করে। কুস্‌মী চোখ মেলে তাকায়।

হেবো একটু ভয়ে ভয়ে বলে, এই গুরু, সাধুজী জেগে আছেন।

এমন কি ছোটেলাট পর্যন্ত যোগানন্দ মহারাজকে সমীহ করে। মেজাজটা সামলে নিয়ে সে মন্দিরের পাশের ঘরটির দিকে তাকায়। জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

নিচু গলায় সে বলে, মাইরি, বহুৎ আদমি দেখা, লেকিন এমন একটা লোক আর দেখলাম না। সারারাত ঠায় জেগে বসে থাকে? তোরা কোনো দিন ঘুমুতে দেখিস নি?

না।

তাজ্জব বাৎ!

সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টে সে আবার চোখ গরম করে খান্নুকে বলে, খোকনাটার কথা আমায় কক্ষনো জিজ্ঞেস করবি না। সে হারামী খানকির বাচ্চা আমায় ধোঁকা দিয়ে ভেগেছে। একবার তাকে পেলে—

সবাই চুপ করে থাকে। খোকনের সত্যিই এত সাহস যে সে ছোটেলাটকে চটায়! তার প্রাণের ভয় নেই?

ছোটেলাট এ পাড়ার কিংবা এই বস্তির মানুষ নয়। সে

কোথায় কখন থাকে কেউ জানে না। তবে এখানকার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে। তার ঘনিষ্ঠতম সহকারী খোকন এই এখানকার মন্দিরের চাতালের ছেলে। হেবো, ধান্নুর মতনই সে একসময় এখানে শুয়ে থাকতো।

সমস্ত রেলস্টেশন, শ্মশান এবং মন্দিরে কিছু পরগাছা থাকে। তারা কোথা থেকে আসে, কোন মায়ের পেটে জন্মায় তার কোনো হিসাব নেই। যাত্রীদের ওপর নির্ভর করে দিব্যি বেঁচে থাকে এরা, ফুট-ফরমাস খাটে, সুযোগ পেলেই ঠকায়। আর ধর্মস্থানে তো বেশীর ভাগ লোক ঠকতেই আসে। এই মন্দিরেও আছে চার-পাঁচজন, খোকন তাদের একজন।

ছোটেলাট মাঝে মাঝে এদের কাজ দেয়। মাল সরাবার কাজ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়, তাতেই অন্তত একশো টাকা লাভ। ছোটেলাটের দিল খুব দরাজ।

খোকনও সেইরকম কাজই করতো হেবো, ধান্নুদের মতন। তারপর কী করে যেন সে ছোটেলাটের দারুণ বিশ্বাসভাজন হয়ে গেল, সে ছোটেলাটের ছায়ার মতন সর্বক্ষণের সঙ্গী। এমন কি দুপুর বারোটায় যখন মানুষের কোনো ছায়া পড়ে না, তখনও কিন্তু পর পর দু'সপ্তায় ছোটেলাট এখানে এলো, অথচ সঙ্গে খোকন নেই।

দুটো কাজ আছে।

বলো, গুরু।

মাছওলা পাঁচুকে ডেকে নিয়ায়।

সে তো নেই!

খতম হয়ে গ্যাছে?

না না, রাত্তিরের দিকে প্রায়ই থাকে না।

মাঠে ঘাস খেতে যায়?

হে হে হে হে!

যেখান থেকে পারিস পাঁচুকে ধরে নিয়ায়।

মাছওয়ালা পাঁচু ছোটেলাটের চেয়ে বয়েসে অন্তত দশ-বছর বড়,

কিন্তু যার পকেটে রিভলবার থাকে, সে কখনো অন্তদের দাদা-কাদা বলে না।

মাছওয়ালা পাঁচু নিছক মাছ-বিক্রেতা নয়, তার চেয়ে একটু উঁচুতে। বাজারে একটা উঁচু রকের ওপর তার দোকান, সে নিজে কখনো মাছ কাটে না কিংবা ওজন-পাল্লা ধরে না, সে সব ধরে তার একজন সহকারী। সে পেছন দিকে একটা বড় কাঠের বাকসের ওপর বসে থেকে খদ্দেরের কাছ থেকে টাকা নেয়। তার গলায় একটা সোনার মফচেন।

হেবো ছুটে চলে যায় পাঁচুকে খুঁজতে।

ছোটেলাট এবার ধানুর দিকে ফিরে বলে, তুই যা, নেতাইকে একবার খবর দে।

ধানু শঙ্কিত হয়ে বলে, এখন ?

এখন না কি তখন ? যা···

নেতাইদাকে এখন ডাকা···কী করবে ?

তোর বাপের নামে পূজো দেবো।

না, বলছি, এত রাতে···মহারাজজী টের পেলে···

ছোটেলাট ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে বললো, ফের মুখে মুখে কথা! যা শালা—

ধানু ভয়ে ভয়ে উঠে পড়ে মন্দিরের দিকে এগোয়।

নিতাই ভট্‌চাজ মন্দিরের বেশকার। সে মায়ের মন্দির পরিষ্কার করে, মূর্তির গলায় বাসি ফুলের মালা পাল্টে নতুন মালা পরায়, বছরে দু'বার সাজ-পোশাকও পাল্টায়। তা ছাড়া সে যোগানন্দ আচার্যের ব্যক্তিগত ভৃত্যের মতন, তাঁর সব কিছু দেখাশুনোর ভার নিতাইয়ের ওপর।

নিতাই কবে, কী ভাবে এখানে এসেছে তা কারুর মনে নেই। একসময় সে মন্দিরে এসে ধর্না দিয়েছিল। তারপর থেকে থেকেই যায়। ক্রমে ক্রমে সে তার ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সেবা-যত্ন দেখিয়ে নিজেকে অবধারিত করে তুলেছে। এখন তার গলায় ধপধপে মোটা পৈতে। তার ব্রাহ্মণত্বের একটা বড় প্রমাণ, তার রং ফর্সা, যদিও মুখখানা

চোয়াড়ে। যে-সব নারী-পুরুষ যোগানন্দ আচার্যর কাছ থেকে উপদেশ নিতে আসে, নিতাই সুকৌশলে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করে। এ ব্যাপারে মন্দিরের অন্য কর্মচারী হরিহরের চেয়ে সে অনেক বেশী ধুরন্ধর।

চাতালে রাতের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথা বলে। যোগানন্দ মহারাজ সারারাত জেগে ধ্যান করেন, গোলমাল শুনলে তিনি রেগে যান খুব। তিনি ইচ্ছে করলে সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারেন এখান থেকে।

নিতাই ভট্চায অবশ্য রাতে দু'তিনবার জাগে। মহারাজজীকে চা বানিয়ে দিতে হয়। ধানু লোহার গেট টপকে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে পা টিপে টিপে নিতাইয়ের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। একটা সুবিধে আছে, আওয়াজ টাওয়াজ পেলেও মহারাজজী উঠে দেখতে আসবেন না। চোরে যদি সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়, তাহলেও যোগানন্দ মহারাজ সারারাত উঠবেন না আসন ছেড়ে।

জানলায় ঠুক ঠুক শব্দ হতে নিতাই জেগে উঠে কে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো না। সে এসে জানলার কাছে দাঁড়ালো।

ধানু প্রায় আলজিভ দিয়ে কথা বলে জানালো যে ছোটেলাট তাকে ডাকছে।

বিরক্তিতে মুখটা কুঁচকে উঠলেও নিতাই বললো, যাচ্ছি।

ছোটেলাট ততক্ষণ কুস্‌মীকে জ্বালাতন করছে। একটা কিছু না করে সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না।

কুস্‌মীর মাথাটা ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ছে দেখে ছোটেলাট উঠে গিয়ে এক পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে তার থুতনিটা উঁচু করে তুলে বললো, এই ঘাড় মটকে যাবে যে! শুয়ে ঘুমোতে পারিস না? তোকে কেউ ইয়ে করবে-না।

ঘুম ভাঙ্গার পর প্রাথমিক বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে কুস্‌মী কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে ছোটেলাটের দিকে। তারপরই রাগে মুখ কুঁচকে সে ছোটেলাটের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করে।

ব্রিজের রেলিং টপকে চোখের নিমেষে লাফিয়ে পড়তে পারে ছোটেলাট। তার শরীর সদা সতর্ক, তাকে ফেলা অত সহজ নয়, সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে অতখানি রাম খেয়েও।

কুস্‌মী তার পা ধরে টানাটানি করে আর ছোটেলাট হাসে।

ব্যর্থ হয়ে কুস্‌মী হিস হিস করে বলে, মর, মর তুই, তোর কলেরা হোক।

হয়েছিল একবার কলেরা, তাও হজম করে ফেলেছি, কলেরা হজম।

তোকে পুলিসে গুলি করে মারুক।

আরে যাঃ।

ছোটেলাট আর একবার জুতোসুদ্ধ পা-টা তার থুতনিতে ছোঁয়াতেই কুস্‌মী বলে, ডাকবো মহারাজজীকে?

ডাক না। গলা চাপকে তেরা শাস নিকাল দেগা।

একটু সরে এসে ছোটেলাট রামের বোতলটায় শেষ চুমুক দেয়। তারপর বোতলটা ছুঁড়ে দেয় ঠিক মাঝরাস্তায়। ঝনঝন করে কাচ ভাঙার শব্দ শোনা তার খুব প্রিয় শখ।

নিতাই ভট্‌চায কাছে এসে বলে, কী খবর, ছোটেলাট?

তোমার সঙ্গে দু'চারটে কথা আছে।

অনায়াসে নিতাই ভট্‌চাজের কাঁধে হাত দিয়ে ছোটেলাট তাকে খানিক দূর টেনে নিয়ে যায়। একটুক্ষণ গভীরভাবে কিছু আলোচনা করে। তারপর পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে বলে, কাল আমার নামে পুজো দেবে মায়ের কাছে। ভালো সন্দেশ আনাবে। মোড়ের দোকানে আমার নাম করে বলবে, যদি পাউডার মিল্কের মাল দ্যায়, তা হলে আমি ওর হাত ভেঙে দেবো।

না না, মায়ের পুজোয় ওরা খারাপ জিনিস দেয় না। তুমি প্রসাদ নিতে আসবে না?

রেখে দিও একটুকরা, কোনো সময় আসবো।

আর কী খবর বলো?

সব ভালো খবর। বারাসতে তোমার বউবাচ্চা আছে, তাদের

দেখভালের দায়িত্ব আমার। তোমার ছেলেটা ইস্কুলে যাচ্ছে।

নিতাই ভট্চাজের মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়ে।

হে-হে-হে-হে করে হেসে ওঠে ছোটেলাট। তারপর নিতাইয়ের কাঁধ চাপড়ে বলে, ভালো আছে, ভালো আছে!

রাম খাওয়া হয়ে গেছে, তাই আর জল পানের দরকার নেই। হাতের টিনের গেলাসটা শব্দ করে রাস্তায় ফেলতেই নিতাই ভট্চাজ বলে, আস্তে, গুরুজী রেগে যাবেন।

ছোটেলাট টিনের গেলাসটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সেটাকে চ্যাপ্টা করে দেয়। কুস্‌মী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, কিছু বলে না।

ছোটেলাট পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে সেটাকে ভাঁজ করতে করতে একটা ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্যাকেট করে ফেলে। তারপর সেটা ছুঁড়ে দেয় কুস্‌মীর কোলের ওপর।

লে, আর একটা গিলাস কিনে লিস।

নিতাই ভট্চাজ বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে, আমি এবার যাই, ছোটেলাট?

যাও। চিন্তা করো না, সব ঠিক হ্যায়।

হেবো ফিরে এসে জানালো, মাছওয়ালা পাঁচুকে সে কোথাও পায় নি।

ছোটেলাট একটু চিন্তা করে বলে, ওভারব্রীজের নিচে বাঁদিকে একটা গলতা আছে সেখানে থাকতে পারে। ভাঙা টিউকলের মধ্যে মাল রাখে। নোংরা কারবার। এ শালারা আঁস্তাকুড়ের মুর্গী, নোংরা খুঁটে না খেলে এদের পেট ভরে না।

এই সময় একটা ট্যাক্সি এসে সেখানে থামলো। ছোটেলাট ট্যাক্সিটা থামবার আওয়াজ শুনেই বিদ্যুৎগতিতে সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। (এক হাত পকেটে, অন্য হাতটা বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা।) একে বলে পজিশন নেওয়া।

টাক্সি থেকে পাজামা ও বুশশার্ট পরা একটি লোক নেমে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। যেন সে কারুকে খুঁজছে না, নিজেকেই

দেখাতে এসেছে।

ট্যাক্সির আওয়াজ শুনেই নিতাই চট্ করে ঢুকে গেছে মন্দিরের মধ্যে। হেবো আর ধনা ঘুমের ভান করে মাটিতে শুয়ে পড়লো মড়ার মতন। শুধু কুস্মী চেয়ে রইলো একদৃষ্টে।

ট্যাক্সি থেকে নামা লোকটা জুতোর শব্দ করে হাঁটতে লাগলো এদিক-ওদিকে।

ছোটেলাট একটা শিস দিতে আগন্তুকও উত্তরে একটা শিস দিল। ছোটেলাট তখন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী? তোকে সোনাগাছি রেখে এলুম, সেখান থেকে আবার বেরিয়ে এলি কেন?

কথা আছে।

রাতটা ওখানে থাকতে পারলি না? শালা, আতর না কী মেখিচিস? গা দিয়ে বদবু বেরুচ্ছে!

চলো গুরু, কথা আছে।

যাচ্ছি, তুই উঠে বোস।

ছোটেলাট মুখ ফিরিয়ে হেবোকে বললো, পাঁচুকে বলবি, কাল বিকেলে পার্ক সার্কাস মার্কিটে ইয়াকুব আলমের সঙ্গে যেন ঠিক দেখা করে, তার মুর্গীর দোকান আছে। মনে থাকবে?

হ্যাঁ, গুরু।

কী নাম বললাম?

এই সামান্য কথাটাও হেবো মনে রাখতে পারে না। সে আমতা আমতা করে।

ধানু বলে, আমার মনে আছে, গুরু।

বল দেখিনি।

· ধানু ঠিকঠাক পরীক্ষা দেয়।

ছোটেলাট ধানুর পিঠচাপড়ে বলে, ঠিক হ্যায়। হেবোকে পাছাসে একলাথ মার। কাঁঠালের আমসত্ত একটা।

ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েও ছোটেলাটের একটা কথা মনে পড়ে যায়। সে ফিরে এসে দাঁড়ালো মন্দিরের গেটের কাছে। পা থেকে

জুতো খুলে ফেলে খালিপায় দাঁড়িয়ে চোখ বুজে, কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলো। এবং বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, মা মা, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই…এ নোকরের দিকে তোমার চোখ রেখো মা, তোমার দয়া ছাড়া কিছুই হয় না……

প্রায় যেন জল এসে গেল চোখে, জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছলো ছোটেলাট।

ট্যাক্সিতে উঠবার আগে দৃষ্টি ধারালো করে সে একবার দেখে নিল ড্রাইভার ও তার সহকারীকে। তারপর উঠে বসার পর ট্যাক্সিটা চলতে শুরু করতেই সে বললো, যাস শাললা! দেশলাইটা ফেলে এলাম! ঘোরা, ঘোরা!

আমার কাছে দেশলাই আছে গুরু!

ছোটেলাট তবু আফসোসের স্বরে বলে, নতুন দেশলাই, মোটে কটা কাঠি খর্চা হয়েছে—

গাড়লের মত কেশে ট্যাক্সিটা ছুটলো সামনের দিকে। দু' পাশে আলো জ্বালা রাস্তাটায় যত দূর দেখা যায় শুধু এই একটাই মাত্র গাড়ি। আর কোনো মানুষজনের চিহ্নও নেই। যেন একটা ভুতুরে শহর।

॥ ৪ ॥

সমর্থ পুরুষরা সবাই বেরিয়ে যায় দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে। শুধু বিশ্বদেব একা বাড়ি থাকে। সে অফিসে যায় বিকেলে, তিনটে থেকে দশটা পর্যন্ত ডিউটি থাকে তার সাধারণত।

সারা দুপুর এত বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে বিশ্বদেবই একা পুরুষ মানুষ। যদিও দরজা বন্ধ করে দিলে কারুর সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই, সব ফ্ল্যাটেই আলাদা আলাদা বাড়ি, তবু একই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে হয় তো!

কিছুদিন আগেও সামনের পার্কের পাশের চায়ের দোকানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তুমুল আড্ডা জমতো রোজ। কিন্তু এখন

বিশ্বদেবের প্রায় সব বন্ধুই চাকরি পেয়ে গেছে, একমাত্র প্রিয়ব্রত ছাড়া। রবিবার সকাল ছাড়া চায়ের দোকানে আর তেমন আড্ডা হয় না।

প্রিয়ব্রত বেকার বলে তার প্রতি অন্য বন্ধুদের সহানুভূতি থাকার বদলে সবাই আজকাল তাকে এড়িয়ে চলে। প্রিয়ব্রতর চেহারা খারাপ নয়, মোটামুটি একটা অনার্স ডিগ্রিও পেয়েছে, কিন্তু কোথায় যে কিসের একটা খুঁত আছে তার, যে জন্য সে কিছুতেই চাকরি পায় না। এমন কি ইস্কুল-মাস্টারিও না।

যেখানেই চাকরির সন্ধানে যায় প্রিয়ব্রত, সেখানেই সে শুনতে পায়, তার একটু দেরি হয়ে গেছে। আর এক দিন দু' দিন আগেও যদি সে আসতো। তার তো সব রকম যোগ্যতাই আছে, কিন্তু গত কালই তা একজন লোক নেওয়া হয়ে গেল।

বিশ্বদেব চেষ্টা করেছিল একটা স্কুলে প্রিয়ব্রতর চাকরি জুটিয়ে দেবার জন্য, সেখানে ইণ্টারভিউ দিয়ে প্রিয়ব্রত পারে নি। ফিরে এসে সে বলেছিল, পেলেও কি ও চাকরি করতে পারতুম? রোজ ফর্সা জামা কাপড় পরে যেতে হবে, অথচ মাইনে দেবে বলছে সাড়ে পাঁচ শো টাকা। তুই জানিস, বিশ্ব, বিড়লার নার্সিং হোমে একজন ধাঙড়ের মাইনে সাড়ে ছ' শো টাকা?

কথাটা শুনে রাগ হয়ে গিয়েছিল বিশ্বদেবের।

বেকার বলেই যেন একটা অধিকার জন্মে গেছে প্রিয়ব্রতর, সে কখনো চায়ের দাম দেবে না, সে বন্ধুদের সিগারেটের প্যাকেট থেকে বেমালুম খেয়ে যাবে একটার পর একটা। হাতখরচের পয়সাও যার থাকে না, সে পুরুষ-মানুষের ব্যক্তিত্ব বলেও কিছু থাকে না।

বিশ্বদেব দিনের বেলা বাড়ি থাকে বলেই যে প্রিয়ব্রত দিনের পর দিন তার কাছে এসে সময় কাটাবে, এ অধিকার তাকে দেওয়া যায় না। বারান্দা দিয়ে বিশ্বদেব দেখলো, দূরে কালীমন্দিরের সামনে দিয়ে হেটে আসছে প্রিয়ব্রত। নির্ঘাৎ এখানেই আসবে। চট্ করে সরে এলো বিশ্বদেব। পাজামা, গেঞ্জি পরাই ছিল, তার

পর পাঞ্জাবিটা গলিয়ে সে বললো, মা, আমি একটু পাঁচতলা থেকে ঘুরে আসছি। কেউ ডাকতে এলে বলো, আমি নেই!

ডাক্তার পরিবারটির সঙ্গে বিশ্বদেবের বেশ ভালো সম্পর্ক। সেখানে সে যখন তখন যেতে পারে। ডাক্তার সেন সাড়ে বারোটা একটার সময় একবার আসেন খাওয়ার জন্য, আবার দুটোর সময় বেরিয়ে যান। মাঝে মাঝেই তিনি অবশ্য ফোন করে জানিয়ে দেন যে হাসপাতালের ক্যান্টিন থেকে খেয়ে নেবেন, বাড়ি ফেরা হবে না। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বিশেষ করে তাঁর বড্ড রুগীর চাপ থাকে। ডাক্তারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শীতের শেষ দিকেই নাকি বেশী মানুষ মরে। এবার তাড়াতাড়ি গরম পড়ে গেছে, তবু বেশী মানুষ মরছে, কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিও তো চলে গেলেন।

বেল দেবার পর দরজা খুলে দিল দীপা বৌদি। অন্যদিনের চেয়েও যেন একটু বেশী হাসি মুখে বললো, এসো—।

সম্পূর্ণ অচেনা একজন যুবক ও দুজন যুবতী বসে আছে ভেতরে। বিশ্বদেব ভেতরে ঢুকে একটু অস্বস্তিতে পড়ল।

হঠাৎ যেন কোনো একটা কথার মাঝখানে সবাই চুপ হয়ে গেছে। এমন পরিবেশ। এরকম জায়গায় এসে পড়লে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয়।

দীপা বৌদি আলাপ করিয়ে দিল, এ আমার পিসতুতো ভাই রঞ্জন, জম্মুতে থাকে। আর এরা হচ্ছে রীণা আর সুস্মিতা।

দীপা বৌদি মেয়ে দুটির কোনো পটভূমিকা জানালো না, আর বিশ্বদেবেরও কোনো পরিচয় দিল না। সাংবাদিক হবার পর বিশ্বদেব যে-কোনো পরিস্থিতিরই একটা ইন ডেপ্‌থ স্টাডি করতে চায়। মেয়ে দুটির মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই তার মনে হলো, ওদের মনের মধ্যে যেন কিসের চাঞ্চল্য রয়েছে। সেই তুলনায় যুবকটি শান্ত সমাহিত। কেউই বিশেষ কোনো কথা বলছে না।

দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই বিশ্বদেব বললো, বৌদি, একটা বই নিতে এসেছিলাম···

নেবে। বসো। চা খেয়ে যাও।

এবার দীপা বৌদি ওর পরিচয় করিয়ে দিল, তোমরা কাগজে এর নাম প্রায়ই ছাখো, বিশ্বদেব সেনগুপ্ত, অমুক কাগজের রিপোর্টার।

মেয়ে দুটি এবার উৎসুকভাবে তাকালো বিশ্বদেবের দিকে।

বিশ্বদেবের নাম কাগজে বেরোয় বছরে দু'তিনবার মাত্র। সে জুনিয়ার রিপোর্টার, বাই লাইন পায় খুব কম, তার নাম শুনে এদের চিনতে পারার কথা নয়। তবু খবরের কাগজের লোকদের সম্পর্কে অনেকের কৌতূহল থাকে।

মেয়ে দুটির চোখে বিশ্বদেব একটু গুরুত্ব পাচ্ছে বলেই হয়তো, রঞ্জন, খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, আমি থাকি জম্মু থেকে এগারো মাইল দূরে সার্ভে ক্যাম্পে, সেখানে কাগজ-টাগজ কিছুই পৌঁছোয় না।

অর্থাৎ সে বিশ্বদেবের লেখা-টেখা কিছু পড়েনি, জানিয়ে দিল।

দীপা বৌদি জিজ্ঞেস করলো, তোরা কোনো কাগজ পড়িস না? খবর-টবর কিছু পাস না?

রেডিও আছে। সপ্তাহে দু দিন জম্মু থেকে আসে ইংরিজি কাগজ। তবে, জানিস ছোড়দি, যে-জায়গায় আমরা থাকি, সেখানে থাকলে সারা দেশের মারামারি কাটাকাটি আর নোংরা রাজনীতির খবর-টবর জানতেও ইচ্ছে করে না।

বিশ্বদেব বললো, আমি জম্মু হয়ে শ্রীনগর গেছি গত বছর।

রঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে উগ্রভাবে বললো, দুটোই খুব বাজে জায়গা। এখান থেকে দলে দলে টুরিস্ট গিয়ে ওসব জায়গা আরও বিচ্ছিরি করে ফেলেছে। আমি যেখানে থাকি, খুব রিমোট, কোনো টুরিস্ট যায় না, সেখানে মানুষগুলো এখনো সরল, স্কাই লাইন ঢেকে আছে পাহাড়, সারা বছর মাথায় বরফ ঢাকা, সেদিকে চেয়ে চোখ পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়! আমার তো আজকাল কলকাতায় এলেই খারাপ লাগে, দু' দিনে হাঁপিয়ে উঠি।

রঞ্জন গোড়া থেকেই বিশ্বদেবকে অপছন্দ করেছে। তার হঠাৎ

এসে পড়া ওর মনঃপূত হয়নি। কিন্তু বিশ্বদেব এখনো বুঝতে পারছে না, এই যুবক-যুবতী তিনটির কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক। এটা জানতে না পারলে বড় অস্বস্তি হয়।

মেয়ে ছুটি একটি কথাও উচ্চারণ করছে না।

প্রকৃতি-প্রেমিক রঞ্জন কিন্তু পরের মুহূর্তেই প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, বলতে পারেন সামনের বাজেটে সি ডি এস উঠে যাবে কি না?

বিশ্বদেব বিনীতভাবে বললো, আমি ঠিক বলতে পারি না।

আপনারা রিপোর্টাররা এই চোর-জোচ্চোর, বিবেকহীন লীডার-গুলোকে নিয়ে যেমন মাতামাতি করেন রোজ, এতে দেশের কী লাভ? দেশের সাধারণ মানুষের কথা কতটুকু লেখেন আপনারা?

এসব কথা শোনার অভ্যেস আছে বিশ্বদেবের। যে-লোক খবরের কাগজ পড়ে না কিংবা পড়াটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে, সেও সমালোচনা করে খবরের কাগজের।

তাছাড়া, সকলেরই ধারণা, সাংবাদিকরা বুঝি সবজান্তা। সরকারের গোপনতম খবরও তাদের নখদর্পণে। এবং সাংবাদিকরা বুঝি তাদের মনের কথা খোলাখুলি লিখতে পারে। এ চাকরিতে ঢুকবার আগে বিশ্বদেবও এরকম ভাবতো। অনেকে মনে করে, সাংবাদিকরা বুঝি সর্বক্ষণ শিকারী কুকুরের মতন খবরের সন্ধানে সারা দেশে বোঁ বোঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছে। অথচ বিশ্বদেব অফিসে গিয়ে অধিকাংশ দিনই কোনো আসাইনমেণ্ট পায় না, কিংবা কপি লিখে দিয়ে এলেও তা ছাপা হয় না। কিংবা কেটেকুটে ছু ইঞ্চি বেরোয়। তবু তাকে শুনতে হয়, আপনারা যা লিখছেন! বিশ্বদেবের হাসি পায়।

অবশ্য একথা ঠিক, কোনো কোনো জায়গায় গিয়ে বিশ্বদেব নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দিতে বেশ গর্ববোধও করে। কারুর বাড়ির টেলিফোন অনেক দিন ধরে খারাপ। বিশ্বদেব সেখানে উপস্থিত থাকলে অবজ্ঞার সঙ্গে বলে, ঠিক আছে টেলিফোনের জেনারেল ম্যানেজারকে বলছি, ছু' দিনেই আপনারটা ঠিক হয়ে যাবে। ওরা খবরের কাগজের লোকদের খুব ভয় পায়।

কলেজে পড়ার সময় থেকেই বিশ্বদেবের শখ ছিল যে সে সাংবাদিক হবে। তার মা-বাবার ইচ্ছে ছিল, সে আই এ এস পরীক্ষা দিক্। বিশ্বদেব জেদ করে সে-সব চাকরির দিকে ঝোঁকে নি। এখন, সাংবাদিকতা তার পছন্দ না হলেও ছেড়ে যাবার পথ নেই : এই পেশা অনেকটা নাগপাশের মতন।

একটু বাদেই রঞ্জন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, ছোড়দি, আমি চলি।

সে কি, তুই দুপুরে খাবি না ?

হ্যাঁ খাবো। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ঘুরে আসছি। এখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ? কলকাতার ট্রামে বাসে তো ওঠাই যায় না। আমি হাঁটতে ভালোবাসি, কিন্তু এখানকার রাস্তায় এমন দুর্গন্ধ !

চা হয়ে গেছে, চা খেয়ে যা।

আমি সকালে শুধু একবার চা খাই !

রঞ্জন বেরিয়ে যাবার পর দীপা বৌদি খানিকটা কৈফিয়তের সুরে বললো, ও দিল্লিতে মানুষ হয়েছে তো. তাই কলকাতা ওদের চোখে বড্ড নোংরা লাগে। ও কিন্তু বাংলা খুব ভালবাসে. চমৎকার রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে।

বিশ্বদেবের মনে হলো, রঞ্জনের এই আকস্মিক প্রস্থানের জন্য যেন সে-ই দায়ী। এই ঘরে এখন শুধু একটি মাত্র পুরুষেরই জায়গা ছিল। বনে-জঙ্গলে এক একটি বিশেষ এলাকায় যেমন একটি মাত্র পুরুষ-মহিষ কিংবা সিংহ থাকে। কিন্তু বিশ্বদেব কী করবে, দীপা বৌদিই তাকে জোর করে বসালেন।

মেয়ে দুটি এখনো নীরব।

দীপা বৌদি জিজ্ঞেস করলো, তোরা এখান থেকে বাড়ি যাবি ?

তার উত্তরেও ওরা ঘাড় কাৎ করে হাঁ বলে, মুখে কিছু উচ্চারণ করে না।

একা পুরুষ হিসেবে বিশ্বদেব এবার একটা দায়িত্ব বোধ করে : এখন তারই কথা চালিয়ে যাওয়া উচিত। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের সঙ্গে এখনো ঠিক আলাপ হলো না,

আপনারা কাছেই থাকেন ?

দুজনের মধ্যে বিশেষ কারুকে উদ্দেশ করে সে কথাটা বলেনি. তবে রীণা নাম্নী মেয়েটির দিকে বুঝি সে দু মুহূর্ত বেশী চোখ রেখেছিল।

সুতরাং রীণা শরীরে সামান্য মোচড় দিয়ে এবং সঙ্গিনীর দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে বললো, বকুলবাগানে।

সত্যিই যেন কোথাও সার সার বকুল গাছের বাগান আছে, টুপটাপ করে সব সময় ঝরে পড়ছে বকুল ফুল, চারদিক সুগন্ধে আমোদিত, সেইখানে থাকে এই মেয়ে দুটি। ওদের সারা শরীরে বকুল ফুলের গয়না, অরণ্যকুমারীর মতন ওরা কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটে—।

পরক্ষণেই এ চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে বিশ্বদেব আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনারা…কি ছাত্রী ?

না।

দীপা বৌদি যোগ করে দিলেন, ওরা দুজনই যাদবপুর থেকে এম এ পাস করেছে তিন বছর আগে। সুস্মিতা শিগগিরই একটা কলেজে পড়াবে, তাই নারে সুস্মিতা ?

সুস্মিতা তার মুখখানিকে সুস্মিতা করে রাখলো।

তিন বছর আগে ? এই ক'বছর কী করলেন।

মেয়ে দুটি উত্তর না দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকায় ?

এম এ পাস করার পর আপনারা কি চাকরি করতে চান নি, না চাকরি পান নি?

বাবারে বাবাঃ। তুমি কি ওদের জেরা করছো নাকি, বিশ্ব ?

বিশ্বদেব লজ্জা পেয়ে গেল। খবরের কাগজে কাজ করার জন্যই বোধ হয় আজকাল কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই এরকম তথ্য-সন্ধানী প্রশ্নাবলী এসে যায়। মেয়েদের মধ্যে কত ভাগ ইচ্ছাকৃত বেকার সেটাই সে জানতে চেয়েছিল।

রীণা খুব দ্রুত চা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমরা চলি, দীপাদি ?

এক্ষুনি যাবি ? আর একটু বোস না। সন্দেশ খেলি না ?

খেয়েছি। যাই।

দুই যুবতী বিশ্বদেবের দিকে হাত তুলে নমস্কার করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ওরা পরে আছে বেশ দামী তাঁতের শাড়ি, একজনের হাতে কাচের চুড়ি, অন্যজনের হাতের এক আঙুলে একটি জল-রঙের পাথর বসানো আংটি। বকুল ফুলের গয়না কেউ পরে নি, বকুলবাগান পাড়াতে একটিও বকুল গাছ আছে কিনা সন্দেহ।

দীপাবৌদি ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। ফিরে এসে সে বিশ্বদেবকে জিজ্ঞেস করলো, ওদের কারুকে তোমার পছন্দ হয় ?

দুজনকেই।

সত্যি ?

হ্যাঁ, বেশ তো সুন্দর, কম কথা বলে !

কম কথা বলে ? মোটেই নয় ? আজ নেহাত একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঐ যে রীণা, ও এমন নকল করতে পারে সবাইকে—এই যে তোমাকে আজ দেখলো, এর পরদিন দেখাবে তুমি কেমন করে হাঁটো, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমার গলাটা কেমন ভারী হয়ে যায়—

আমার সঙ্গে তো ভালো করে আলাপ করিয়েই দিলে না !

দেবো। তুমি তো আছোই। আগে দেখি রঞ্জনের কী মতামত। ও আবার বড্ড খুঁতখুঁতে, কোনো মেয়েকেই ওর সহজে ঠিক মনে ধরে না।

বিশ্বদেব দীপা বৌদির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। এইবার এই পরিবেশটার অর্থ তার কাছে স্পষ্ট হয়। ইস, তার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এখানে কি বিয়ের জন্য পাত্রী দেখাবার ব্যাপার চলছিল নাকি ?

দীপা বৌদি একগাল হেসে বললেন, হ্যাঁ। ওরা কেউ কিন্তু তা জানে না।

এখন সে জিতে দেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তৎক্ষণাৎ একটি রচনার

প্রথম দু'এক লাইন মনে এসে গেল তার। গ্রাম ভেঙে শহর তৈরি হয়। কিন্তু প্রত্যেক শহরের মধ্যেই গ্রাম লুকিয়ে থাকে। শহরের জীবনযাত্রা যতই আধুনিক হোক তবু অনেক গ্রাম্যপ্রথা টিকে থাকবে ভেতরে ভেতরে···।

ও, মেয়ে দেখাবার ব্যাপার চলছিল। তাহলে রঞ্জন ছেলেটি তো রাগ করবেই। এই সময় অপর কোন পুরুষের উপস্থিতি কেউই পছন্দ করে না। দীপা বৌদির উচিত ছিল আগেই কথাটা তাকে জানিয়ে দেওয়া, তাহলে সে এখানে বসতো না।

ওদের দুজনকে আজ চা খেতে ডেকেছিলাম। রঞ্জনের কথাই ছিল আজ এখানে আসবে দুপুরে খাবে ; তাই এই সুযোগে···

দুটি মেয়েই পাত্রী নাকি ?

হ্যাঁ।

একসঙ্গে দুজন পাত্রীকে দেখাবার কথা আগে কখনো শুনিনি। তা-ও একজন পাত্রের জন্য। একটি মেয়েকে পছন্দ করলে অন্য মেয়েটি দুঃখ পাবে না ?

ওরা দুজনে খুব বন্ধু। তা ছাড়া এ তো শুধু আলাপ করিয়ে দেওয়া।

ঐজন্যই ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়নি। আমি আসার পরই কথাবার্তা থেমে গিয়েছিল।

না, না ; ওরা এসেছে অনেকক্ষণ। তুমি এসে ভালোই হল, তুমিও দেখলে, তোমার যদি পছন্দ হয়।

অর্থাৎ রঞ্জনবাবুর বা আমার অধিকার আছে ওদের অপছন্দ করবার। এক কথায় বলে দিতে পারি না, চলবে না। আরও মেয়ে নিয়ে এসো। তোমরা মেয়েরাই মেয়েদের এমন অপমান করাও কেন বৌদি ?

বাঃ, ওরাও ইচ্ছে করলে তোমাদের অপছন্দ করতে পারে। তোমরা চাইলেই কি ওরা বিয়ে করবে নাকি ? ওদেরও মতামত আছে।

(কিন্তু আমরা ইচ্ছেমতন যত খুশী মেয়ে দেখতে পারি বিয়ে করার নামে। ওরা সেইরকম ছেলে দেখে বেড়াতে পারে ?)

ফের খবরের কাগজের লোকদের মতন কথা? শোনো, তুমি বলেছো কিন্তু তোমার পছন্দ হয়েছে।

হ্যাঁ, দু'জনকেই পছন্দ হয়েছে। আমার একটা মুস্কিল কি জানো, আমি মেয়েদের দেখলেই পছন্দ করে ফেলি। এর আগেও অন্তত তিরিশটি মেয়েকে আমার পছন্দ হয়েছে। তাহলে তিরিশ প্লাস এই দুই, বত্রিশটি মেয়েকেই আমার বিয়ে করা উচিত। আজকাল আফ্রিকার কোনো দেশের রাষ্ট্রপতিও একসঙ্গে এতগুলো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না।

দীপা বৌদি হেসে একেবারে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেলেন। বিশ্বদেব ফস্ করে একটা সিগারেট ধরালো।

তোমার খুব শখ বুঝি অনেকগুলো বিয়ে করার?

যাদের যাদের পছন্দ হয়, তাদের কারুকেই কি ছাড়তে ইচ্ছে করে?

তুমি দেখছি হারেম বানাতে চাও!

সেদিন সন্ধেবেলা অফিসে বিশ্বদেব একটা টেলিফোন পেল।

আমি 'রীণা চ্যাটার্জি' বলছি, চিনতে পারছেন?

বিশ্বদেব ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের উত্তর দিল একটা।

আজ সকালেই আলাপ হলো মনে নেই? বকুলবাগানের রীণা।

ও হ্যাঁ, বলুন। আজ সকালে কিন্তু ঠিক আলাপ হয়নি, দেখা হয়েছে শুধু।

আপনার ইচ্ছে থাকলে পরে ভালো করে আলাপ হতে পারে। আপনি আমায় চিনতে না পারলে কিন্তু বন্ধুদের কাছে আমার প্রেস্টিজ থাকবে না। আপনাকে একটা দরকারে ফোন করছি।

বলুন।

আমার বন্ধুরা মিলে একটা গীতিনাট্য করছে, আগামী কাল, আপনি দেখতে আসবেন?

কাল? মানে—

দেখুন, গত বছরও আমরা একটা ফাংশন করেছিলাম, আপনাদের কাগজের অফিসে কার্ড দেওয়া হয়েছিল, কেউ আসেও নি, এক লাইনও খবর বেরোয় নি। আপনারা এরকম কেন করেন বলুন তো!

ওটা অন্য ডিপার্টমেন্ট, আমি ঠিক…

ওসব আমরা বুঝি না। অনেক বাজে বাজে ফ্যাংশানের খবর বেরোয়, অথচ আমাদেরটা…এবার বার করবেন কিনা বলুন? আমি বন্ধুদের বলেছি…

সকালে যে-মেয়েটি একটা দুটোর বেশী কথা বলেনি, সে টেলিফোনে একেবারে কলকলস্বরা। নিশ্চয়ই পাশে ওর দু'একজন বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্বদেব একটু সতর্ক হয়ে গেল। টেলিফোনে অনেক রকম অনুরোধ আসে। মেয়েদের টেলিফোন পেলেই গলে যাবার মতন সে নয়। এই সব খবর ছাপবার ক্ষমতা তার নেই। পশ্চিমবাংলা রাজ্যটির মতনই বাংলা কাগজগুলোতেও আজকাল দারুণ স্থানাভাব। বাংলার সংস্কৃতি সংবাদ এখন অধিকাংশই বেরোয় ইংরিজি কাগজগুলোতে।

বিশ্বদেব কারুকে মিথ্যে আশ্বাস দেওয়া পছন্দ করে না।

মাপ করবেন, এসব খবর বার করার ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই।

আপনার হাত নেই, না আপনি আমাদের জন্য কিছু করতে চান না?

না না, কী আশ্চর্য!

আপনি নিজে দেখতে আসবেন? আপনি নিজে দেখে বলুন ভালো না খারাপ!

আমার মতামতের কী মূল্য আছে?

আপনি আসবেন কি না বলুন! কাগজের লোকদের আজকাল এত বেশী সাধাসাধি করতে হয়!

আচ্ছা যাবো।

কার্ড আপনার অফিসে পাঠিয়ে দেবো, না বাড়িতে? অথবা আমি হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি ঠিক সাতটায়, দেখলে চিনতে পারবেন তো?

ফোনটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেবের মনে হলো, দীপা বৌদির পিসতুতো ভাই রঞ্জন কি রীণা বা স্মিতার মধ্যে কোনো একজনকে পছন্দ করেছে! দুপুরে খাওয়ার সময় আলোচনা হয়েছে নিশ্চয়ই। দুজনের মধ্যে কাকে? যদি রীণাকে পছন্দ করে সে, তাহলেও রীণার এই রকম ফাংশন-টাংশন নিয়ে মেতে থাকা কি সে পছন্দ করবে?

আর একটা কথাও সে ভাবলো। নাইট ইনচার্জকে খুব অনুরোধ করে চার পাঁচ লাইনের একটা খবর ছেপে দেওয়া যেতে পারে। পেজ মেক্‌আপের সময় এক একদিন একটু ম্যাটার কম পড়ে, তখন ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে ভরাতে হয় কিংবা ফিলার জাতীয় কিছু অর্থাৎ চার পাঁচ ছ লাইনের যে কোনো খবর সেখানে ঢুকে যায়। বনগাঁয় বিষাক্ত পুষ্করিণী অথবা সোনারপুরে যুবক খুন ধরনের খবর এইভাবে ছাপা হয়। যুবতী খুন হলে অবশ্য বেশী জায়গা পাবে এবং ছাপা হবেই। কী রকম বয়েস এবং দেখতে কেমন তার ওপর নির্ভর করছে সেই যুবতী খুনের সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠাতেই জায়গা পাবে কিনা। এক একদিন কোনো নিহত যুবতীর চেয়েও কোনো নিহত যুবক বেশী প্রাধান্য পেতে পারে, যদি সে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী হয়। যুবতীর বেলায় যেমন চেহারা এর বেলায় তেমনি কোন দল, তার ওপর নির্ভর করে তার খবর-ভাগ্য।

সাতটা বেজে দশ মিনিটে বিশ্বদেব পৌঁছেছিল অবন মহলের সামনে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একটু দেরি করেই আসে। খোঁপায় ফুলের মালা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রীণা। বকুল ফুল নয়, বেলফুল।

দুঃখিত, দেরি হয়ে গেল, অনুষ্ঠানে আপনার নিজের কিছু নেই?

দুটো কোরাসে পেছন থেকে গান, সে অনেক পরে।

পেছন থেকে? এমন দারুণ সেজেছেন যে দেখে ভাবলুম…

চলুন চলুন, আরম্ভ হয়ে গেছে।

হলটি লোকে প্রায় ভরে গেছে। বিশ্বদেবকে এনে বিশেষ খাতির করে বসানো হলো একেবারে সামনের সারিতে। এরপর দেড় ঘণ্টা ধরে বিশ্বদেব যে গানগুলো শুনলো, তার বেশীর ভাগই বিশ্বদেব তার উনত্রিশ বছরের জীবনেই প্রায় একশো বার শুনেছে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জাতির সঙ্গীত-রচনা প্রতিভা একেবারে খতম করে দিয়ে গেছেন।

শেষ হবার পর বিশ্বদেব যে ভিড়ের মধ্যে মিশে চলে যাবে, তার উপায় নেই। গেটের কাছে রীণা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে আরও তিন-চারজন যুবক যুবতী। রীণা মিছে কথা বলেছিল ; তার দুটো কোরাস গান মঞ্চের ওপরে বসেই। সেইজন্যই অত সাজগোজ। মঞ্চ থেকেই দু'একবার রীণা তার চোখে চোখ ফেলেছে।

চলুন একটু ভেতরে চলুন।

না, আর ভেতরে যাবো না।

বাঃ, আপনার মতামত জানাবেন না ?

অন্য একটি মেয়ে বললো, সাংবাদিকরা সামনা সামনা কিছু বলতে চায় না। আমি আগেও দেখেছি।

আপনার ভালো লাগে নি ?

ভালো লেগেছে। কিন্তু এখন আর থাকতে পারছি না, আমায় আবার অফিসে ফিরে যেতে হবে।

একটু চলুন, একটু চা-টা খেয়ে যাবেন।

সত্যি আজ পারবো না।

বিশ্বদেব মনে মনে শঙ্কিত বোধ করছে, অফিসে যাওয়ার ব্যাপারটা তেমন জরুরী নয়। এদের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করলে এদের দাবি বেড়ে যাবে। এখনো সে ওদের অনুষ্ঠানের চার-পাঁচ লাইনও খবর বার করতে পারবে কিনা তার ঠিক নেই। এরকম অনুষ্ঠান কলকাতায় প্রত্যেকদিন দু'তিনটে করে হয়। উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা করে। কাগজের লোকদের চোখে এর কোনোই নিউজ ভ্যালু নেই।

এক কাপ চা খাবারও সময় নেই ? আচ্ছা এখানে দাঁড়ান, চা

এনে দিচ্ছি।

এরপর আর না বলা যায় না।

এরই মধ্যে রীণা আবার আর একজনকে ডেকে বললো, শুক্তিদি, এদিকে শুনুন শুনুন, এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

বিশ্বদেব বিখ্যাত লোক নয়, শুধু খবরের কাগজে কাজ করে বলেই এদের কাছে উল্লেখযোগ্য।

আপনি রীণার বন্ধু, আপনার কাছ থেকে আমরা একটু সাহায্য চাই।

বিশ্বদেব অপ্রস্তুত ভাবে একঝলক রীণার দিকে তাকায়। রীণাও লজ্জা পেয়েছে। শুক্তিদি বন্ধু বলে ফেললেন, অথচ বিশ্বদেবের সঙ্গে ওর মাত্র এক দিনের পরিচয়।

রীণা অবশ্য কথাটার প্রতিবাদও করলো না।

যদি খারাপ লাগে, তা হলে খারাপ লিখবেন। আমরা তো জোর করে প্রশংসা আদায় করতে চাই না, আমরা চাই গঠনমূলক সমালোচনা।

শুক্তি দেবীর এই ধরনের কথায় বিশ্বদেব মুখখানা হাসি হাসি করে রইলো। এখন এখান থেকে কেটে পড়তে পারলে হয়।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা আবার টেলিফোন।

কই, বেরুলো না তো!

আমি কি কথা দিয়েছিলাম?

তার মানে আপনার ভালো লাগেনি!

সবটা ভালো না লাগলেও কিছু কিছু অংশ ভালো লেগেছে। যিনি কমেন্টারি দিচ্ছিলেন তাঁর উচ্চারণের আর ড়-এর বড্ড গোলমাল।

কী কী ভালো লাগলো?

কাছাকাছি কেউ নেই, তাই টেলিফোনে ইয়ার্কি করা যায়। অবশ্য পি বি এক্সের অপারেটার যে মেয়েদের গলা পেলেই সব শুনে নেয় সে কথা বিশ্বদেবের খেয়াল রইলো না।

সে ফিসফিস করে বললো, সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে কোরাস

দুটো আপনি গেয়েছেন। আপনার গানের গলা চমৎকার।

ইয়ার্কি করছেন!

কেন?

কোরাসে কারুর গলা আলাদা ভাবে বোঝা যায়?

নিশ্চয়ই বোঝা যায়, তার একটা আলাদা টেকনিক আছে।

কী টেকনিক শুনি?

কোনো একজনের মুখের দিকেই শুধু এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে কোরাসের মধ্যে তার গলাটা ঠিক আলাদা ভাবে কানে আসে।

আপনি আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন?

রীণা এত কাঁচা মেয়ে নয় যে এইরকম প্রশংসা শুনে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে। ওরকম কথা অনেক ছেলেই বলে। তবে যে কোনো প্রশংসা শুনলে এক ধরনের পাতলা আনন্দ হয়ই। সে শব্দ করে হাসতে লাগলো।

বিশ্বদেব কোমল গলায় বললো, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

বলুন।

অনেক চেষ্টা করেও যদি আমি আপনাদের অনুষ্ঠানের খবর কাগজে ছাপতে না পারি, তারপরও কি আমার সঙ্গে দেখা হলে কথা বলবেন?

আপনি কি ভাবছেন, আমি নিজেদের নাম ছাপাবার জন্য ব্যস্ত? আমার বন্ধুরা খুব বলছিল, মানে আপনাদের কাগজের খুব নিন্দে করছিল, তাই আমি টপ করে বলে ফেলেছিলাম, একজন রিপোর্টারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।

আলাপটা কিন্তু ভালো করে হয়নি। আপনি বলেছিলেন পরে হতে পারে।

আপনাদের কি আলাপ করবার সময় আছে? আপনারা তো সব সময়ই ব্যস্ত।

আপনি জানেন নিশ্চয়ই অলস লোকরা কোনো কাজে সময় পায় না, আর ব্যস্ত মানুষদেরই হাতে অনেক সময় আছে।

ঠিক আছে, আপনি একদিন আসুন আমাদের বাড়িতে।

বাড়িতে? আপনাদের বাড়িতে আর কারুকে চিনি না...হঠাৎ কি যাওয়া যায়?

তাতে কী হয়েছে? যে-কোনো দিন বিকেলের দিকে আসুন।

যে-কোনো দিন! বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান না, যে-কোনো দিন আসুন বলা মানেই এড়িয়ে যাওয়া। আপনাদের খবর বার করতে পারিনি বলে আপনি এখনো রেগে আছেন।

শুনুন, আমি কোনোদিন খবরের কাগজের অফিসের ভেতরটা কেমন হয় দেখিনি। একদিন ওখানে যেতে পারি? গেলে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হবে?

নিশ্চয়ই। চলে আসুন!

কবে?

যে-কোনো দিন!

এবার রীণাও শব্দ করে হাসলো। বিশ্বদেব যে-কোনো দিন কথাটা খুব জোর দিয়ে বলেছে।

তিনদিনের মধ্যেই চলে এলো রীণা। বিশ্বদেব ভেবেছিল, রীণা বুঝি সঙ্গে আরও দু'তিনজনকে আনবে, কিন্তু সে একাই এসেছে।

সহকর্মীদের ঈর্ষা বিদ্রূপ ও কৌতুক মাখানো দৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে বিশ্বদেব তাকে টেলিপ্রিণ্টারে সর্বক্ষণ খবর আসা, কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ঐ অফিসে কাজ করেন, তাঁদের চেহারা, এবং বিরাট ছাপা যন্ত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। তারপর বাইরে বেরিয়ে খাওয়ালো চীনে দোকানে। মিনি বাসে তাকে তুলে দিতে যাবার সময় বিশ্বদেব আপনি থেকে নেমে এলো তুমিতে। কলেজ জীবনে সমস্ত বান্ধবীদেরই সে তুই বলতো, মেয়েদের সঙ্গে বেশীক্ষণ আপনি আজ্ঞে করে কথা বলতে তার ভালো লাগে না।

দীপা বৌদির ফ্ল্যাটে যে-মেয়েটিকে দেখেছিল, এ যেন সেই রীণা নয়। একটুও আড়ষ্টতা নেই, কথাবার্তায় সাবলীল কৌতুক

মেশানো। বিশ্বদেবের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতেও সে বিশেষ আপত্তি করে নি।

রীণাকে তার বেশ পছন্দ হয়েছে। অনেকটা প্রেম-প্রেম ভাব।

অফিসে ফিরে লোডশেডিং-এর মামুলী একটা রিপোর্ট লিখতে লিখতে সে অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো বার বার। খালি মনে হচ্ছে যেন সে খুব কাছাকাছি সেণ্টের গন্ধ পাচ্ছে। চীনে দোকানে সে রীণার গা থেকে এই গন্ধ পাচ্ছিল, কিন্তু রীণাকে তো সে চুম্বন আলিঙ্গন কিছুই করেনি যে সেই গন্ধ তার নিজের গায়েও লেগে থাকবে!

প্রিয়ব্রত নামের বেকার বন্ধুটিকে সেদিন বারান্দা থেকে আসতে না দেখলে বিশ্বদেব সেই সময় নিজেদের ফ্ল্যাট ছেড়ে দীপাবৌদির কাছে যেত না। তা হলে রীণার সঙ্গে আলাপও হতো না। সে একটা প্রশ্ন করেছিল দুজনের দিকে তাকিয়ে। রীণার বদলে যদি সুস্মিতা জবাব দিত? তা হলে কি সুস্মিতার সঙ্গেই প্রেম হতো তার? প্রেম জিনিসটা এতখানি আকস্মিকতা অবলম্বন করেও টিঁকে থাকতে পারে? অবশ্য প্রেম কি না কে জানে, ভালো লাগা, ভাব, আবার দেখা করার ইচ্ছে।

এই প্রথম মেয়ে নয়, এর আগেও অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে বিশ্বদেবের। এখনো আছে। দু'একবার বিয়ের প্রস্তাবও উঠেছিল। বিশ্বদেব রাজি হয়নি। এক্ষুনি বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হবার ইচ্ছে তার নেই। তিনজন যুবতীর সঙ্গে সে এ পর্যন্ত মোট পাঁচবার বিছানায় শোওয়ার খেলা খেলেছে, কিন্তু এর মধ্যে দুজনকে আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছে, আমি কিন্তু এখন বিয়ে করতে চাই না। বাকি জনকে ও কথা জানাবার প্রশ্ন ওঠে না!

কিন্তু সব সময় ঐ খেলার জন্য সে লুব্ধ ব্যাকুল হয়ে থাকে না। এমন একটা কিছু ব্যাপার নয়। যতদিন অভিজ্ঞতা হয় না, ততদিনই দারুণ কৌতূহল থাকে।

ইচ্ছে করলেই সে বিয়ে না করে থাকতে পারে। কিন্তু মেয়েরা পারে না। রীণা যাদবপুরে পড়েছে, তারও অনেক বন্ধুটন্ধু আছে,

তবুও তাকে বিয়ের পাত্রী সেজে দীপা বৌদির ড্রয়িং রুমে একটি অচেনা লোকের মুখোমুখি বসতে হয় কেন? জাতের ব্যাপার আছে বোধ হয়, ওর বাড়ির লোক জাত-না-মেলানো বিয়েতে রাজি নয়?

এমনিতে দেখলে মনে হয়, রীণার বেশ আত্মসম্মান বোধ আছে, তবু সে অমন ভাবে কনে-দেখানোতে রাজি হলো? রীণা কি জেনে-শুনেই গিয়েছিল, না দীপাবৌদি হঠাৎ ব্যবস্থাটা করেছিলেন?

রীণা ভালো মিমিক্রি করতে পারে। এর পরদিন দেখা হলে জানতে হবে, সে বিশ্বদেবকে কতখানি নকল করতে পেরেছে।

॥ ৫ ॥

ভোরের আলো ফোটার পর যোগানন্দ ধ্যানের আসন ছেড়ে উঠে স্নান করতে যান।

মুনি ঋষিরা ধ্যান করেন পাহাড়ে, পর্বতে, নির্জন প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু যোগানন্দের ধ্যান কলকাতার মতন শহরের রাজপথের ওপর একটি ইঁটের তৈরি ঘরে। সারারাত আলো জ্বেলে তিনি তাকিয়ে থাকেন একটি সাদা দেওয়ালের দিকে। মাঝে দু'তিনবার চা খান; সম্ভবত রাত্তিরের ঘুম জয় করাই তাঁর ধ্যানের লক্ষ্য।

বারোমাস গরম জলে স্নান করেন যোগানন্দ। নিতাই ভট্টাচার্জি আগে থেকেই উঠে সব ব্যবস্থা করে রাখে। স্নান সেরে এসে যোগানন্দ কালমূর্তির সামনে পুজোয় বসেন ঘণ্টাখানেক, তারপর চা ও মুড়ি-নারকোল খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়েন তিন খানা।

ভক্তদের সঙ্গে তাঁর দেখা করার আসল সময় সন্ধ্যে ছটা থেকে নটা, এমন কি প্রয়োজন হলে রাত বারোটা পর্যন্তও তিনি তাদের জন্য সময় দিতে পারেন। তবে সকালেও তিনি দর্শন দেন শুধু নারী-ভক্তদের জন্য, বিশেষ কারণ না ঘটলে সে সময়ে তিনি পুরুষদের সঙ্গে দেখা করেন না। নারীভক্তদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থার কারণ এই যে, তারা অনেকে আসে দূর দূর থেকে, অনেকেই আসে

পুরুষ সঙ্গী ছাড়া, সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে তাদের ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

যোগানন্দের নামে কেউ কোনো বদনাম দিতে পারেনি এ পর্যন্ত। তিনি কখনোই কোনো মেয়ের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করেন না। সকালবেলা ঠিক আটটার সময় তিনি নিজের ঘরটিতে বসেন, মহিলা দর্শনার্থীরা সকলে সেই ঘরে এসে জমায়েত হয়। আজকাল অবশ্য এত বেশী ভক্তরা আসছে যে ঘরে জায়গা হয় না, ভিড় উপছে পড়ে বাইরে। এক দলের কথা শেষ হলে আর এক দল আসে। নিতাই ভট্চাজের ওপর এসব সিজিল মিছিল করার ভার।

অনেকের অনেক এমন গোপন কথা থাকে, যা সকলের সামনে বলা যায় না। তারা যোগানন্দর কাছে কাকুতি মিনতি করে একটু আলাদা ভাবে দেখা করার জন্য। যোগানন্দ টলেন না। তিনি বলেন, তেমন গোপনীয় কিছু থাকলে ডাক্তারের কাছে যা, আমার কাছে আসিস কেন? ডাক্তারের চেম্বারে একজন একজন করে রুগী ঢোকে। কিন্তু তিনি তো ডাক্তার নন। যা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা যায় না, তেমন গোপনীয়তার ভার বহন করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

ভক্তরা অনেক সময় যোগানন্দর দুই চ্যালাকে ধরে কিছু বিশেষ বন্দোবস্তের জন্য। যাদের টাকা আছে, তারা সব সময় অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে কিছু করাতেই অভ্যস্ত। দাক্ষিণাত্যে তিরুপতির মন্দিরে প্রতিদিন বিশাল লাইন পড়ে ভক্তদের। কিন্তু যারা পঁচিশ টাকার টিকিট কেনে তাদের লাইনে দাঁড়াতে হয় না, সরাসরি ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। আরও বেশী টাকা দিলে একেবারে বিগ্রহ স্পর্শ করার অধিকার। ধর্মক্ষেত্রে সাম্য বলে কিছু নেই।

এখানেও সেরকম কিছু ব্যবস্থা হয়। যোগানন্দর অজ্ঞাতসারে তাঁর দুই চ্যালা নানা রকম কৌশল করে। প্রথম দর্শনার্থী বা শেষ দর্শনার্থী হিসেবে কয়েকজনকে নিরালায় ঢুকিয়ে দেয় ঘরের মধ্যে। জানলা দরজা অবশ্য খোলাই থাকে।

সকাল বেলায় মন্দিরের সামনের পথের ছাউনিতে রাতের বাসিন্দারা তাদের পোঁটলা-পুঁটলি গুছিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখে।

কেউ দর্শনার্থীদের কাছে ভিক্ষে করে, কেউ তাদের খিদমদগার হয়। জায়গাটা পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্বও তাদের। একমাত্র কুসুমী ছাড়া আর সবাই ঝাঁটা লাগায়, জল ঢালে।

কুসুমীর এক পায়ে মস্ত বড় দগদগে ঘা, সে একবার মাত্র উঠে অতিকষ্টে হেঁটে পার্কের বাথরুমে যায়। আবার ফিরে এসে সে বসে থাকে ঐ একই জায়গায়। যাত্রীদের ভিড় জমলে সে এক পায়ের উরু পর্যন্ত শাড়ি গুটিয়ে তার হাঁটুর নিচের ঘা-টা বেশ ভালোভাবে মেলে ধরে দর্শনার্থীদের জন্য, সে ঘায়ের ওপর মাছি ওড়ে এবং টুপটাপ করে পয়সা পড়ে তার সামনে। বেশ রোগা হয়ে গেলেও আগের মতন তার মুখের সেই লাবণ্যমাখা ভাবটি এখনো অনেকটা আছে। তার গায়ের ছেঁড়া ঝুলিঝুলি জামাটি দেখলে এখন আর বিশ্বাসই করা যাবে না যে এটি জার্মানীর এক বিখ্যাত দোকান থেকে কেনা এবং রানী এলিজাবেথ ঐ ডিজাইনের জামা পরেন।

কোনো কোনো শিক্ষিত মহিলা গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কথা বলেন ইংরেজিতে। যোগানন্দ যে ইংরেজি সংবাদপত্র পড়েন, এ খবরও রাখে তার শিষ্যরা। যোগানন্দ তাতে আপত্তি করেন না, কিন্তু নিজে সব সময় উত্তর দেন বাংলায়। তাঁর কথায় পূর্ববঙ্গীয় টান স্পষ্ট, আবার ইচ্ছে করলেই তিনি খাঁটি কলকাতার ভাষায় কথা বলতে পারেন। এক এক সময় আবার দু'রকম উচ্চারণই একসঙ্গে চালিয়ে যান। তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং স্পষ্ট।

রীণা জানতো না, তাই সে এগিয়ে গিয়ে যোগানন্দর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, তার মা এই-এই করে উঠলেন। যোগানন্দ হাত তুলে বললেন, আমাকে না, ঐ মাটিকে প্রণাম কর।

ভক্তদের সামনে পদ্মাসনে বসেন না যোগানন্দ। এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে বেশ আরাম করে দেয়ালে পিঠের ভর দিয়ে। ঘরের বাতাস সিগারেটের গন্ধে ভরপুর।

মায়ের অনুরোধে লালপাড় সাদা শাড়ি পরে এসেছে রীণা। সদ্য স্নান করা ভিজে চুল, চোখের পল্লবেও জলে ভেজা ভাব। ঘরের

পঁচিশ-তিরিশটি নারীর মধ্যে সেই সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠা নয়, তার চেয়েও ছোট আরও দু'তিনজন আছে।

বীণার মা পূর্ণিমা বললেন, গুরুদেব, আজকালকার ছেলে মেয়েদের যে ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি থাকছে না, এর কী প্রতিকার করা যায়?

যোগানন্দ সস্নেহে বীণার দিকে তাকিয়ে বললেন, সকলকেই যে ঠাকুর-ছ্যাবতা মানতে হবে, তার কি মানে আছে? এই ছ্যাখ না, খৃষ্টিয়ান কিংবা মুসলমানরা তো আমাদের ঠাকুর-ছ্যাবতা মানে না, তা বলে কি তাদের মধ্যে পুণ্যাত্মা ধর্মাত্মা নাই? তাদের মধ্যেও অনেক সুখী আছে, পবিত্র আছে।

তা বলে হিন্দু হয়ে হিন্দু ঠাকুর দেবতাদের মানবে না?

বীণা বললো, কে বলেছে আমি ঠাকুর-দেবতা মানি না? লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, কালী—সব ঠাকুরকেই আমি নমস্কার করি। কিন্তু আমার বড়দি সন্তোষী-মার পূজো করে। তাই নিয়ে আমি একদিন তর্ক করেছিলুম।

কী মা বললি?

সন্তোষী-মা, আপনি শোনেন নি? দেখুন, বইটই যা পড়েছি তাতে এরকম কোনো দেবতার কখনো নাম পাই নি। হঠাৎ নতুন নতুন দেবতা তৈরি হবে? এ তো সিনেমার দেবতা।

যতদূর আমি শুনেছি মা, যে-কালীমূর্তির আমরা পূজো করি, তার বয়েসও আড়াইশো তিনশোর বেশী নয়। তার আগে এরকম কালীমূর্তি ছিলই না। অথচ এখন ছ্যাখ কত লোক এই মূর্তি পূজা করে কত ফল পায়। তারপর ধর কারখানায় কলে যে বিশ্বকর্মার পূজা করে, সেই মূর্তিটাও তো এই সেদিনের। একশো বছর আগে কেউ বিশ্বকর্মা বলে কোনো দেবতার চেহারাই দেখে নি।

কিন্তু বইতে তো নাম ছিল?

একটা কিছুর পূজা করলেই হয় মন দিয়ে। মনই আসল কথা। বৈষ্ণবরা যেমন শাক্তদের ঠাকুর মানে না, শাক্তরা যেমন বৈষ্ণবদের ঠাকুর মানে না, সেই রকম আমিও যদি…

অধিকাংশ ভক্তরাই উসখুস করছে, এ ধরনের তাত্ত্বিক আলোচনা তাদের পছন্দ নয়। সবাই এখানে আসে ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে।

যোগানন্দ রীণার কথার আর কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। এটাই ইঙ্গিত যে তিনি ঐ প্রসঙ্গের ইতি চান।

রীণার মা পূর্ণিমা বললেন, বাবা, আপনার কাছে একটা বিশেষ কারণে এসেছি। আপনি দয়া না করলে আমার মেয়ে জীবনে সুখী হবে না।

কী হয়েছে ?

মেয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছি, এম.এ. পাস করে অনেকদিন বসে আছে।

ওর ভালো বিয়ে হবে। চিন্তার কিছু নাই গো। সুশ্রী সুলক্ষণা কন্যা।

ওর একটা রোগ আছে। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি, কিছুতেই কিছু হয় না।

যোগানন্দ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রীণার মুখের দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে কোনো দৃশ্য উদ্ভাসিত হলো না। এ মেয়েকে দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না যে, এর কোনো অসুখ থাকতে পারে। তিনি আবার পূর্ণিমার দিকে চাইলেন।

ও একা শুতে পারে না। এত বড় মেয়ে সারাদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড টৈ-টৈ করে বেড়ায়, কিন্তু রাত্রে আমার পাশে শোওয়া চাই। সারাদিন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই, মেয়ের দেখাই পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্তিরে ঠিক আমার পাশে এসে শোবে।

যোগানন্দ হাসলেন।

রীণার মুখে কথা নেই। মাকে বাধা দেবার বদলে সে মুখ নিচু করে আছে।

ঠাকুর দেবতা মানে না, কিন্তু তোর মেয়ে ভূত মানে বুঝি ?

না, ভূত নয়। ওর বন্ধুরা দল বেঁধে কত জায়গায় বেড়াতে গেছে, ও যায় না। রাত্তিরে বাইরে থাকতে হলেই ও আর রাজি নয়। ওর নিজেরই যে লজ্জা আছে। এক এক দিন রাত্তিরে দারুণ চেঁচিয়ে

ওঠে। এমন ভয় পেয়ে যায়...

চিন্তার কিছু নেই, বিয়ের পর ও অসুখ সেরে যাবে।

না বাবা, সে দৃশ্য না দেখলে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। হঠাৎ উঠে বসে দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা মা, আমার মুখখানা ছুঁতে দিও না, দিও না, বাঁচাও আমায়, ঐ আসছে, মা ঐ যে ভুপি আসছে! আচ্ছা বাবা, বিয়ের পরও যদি মেয়ে এমনি কাণ্ড করে, তাহলে কী কেলেঙ্কারি হবে! ওর নিজেরও সেই ভয়, কতবার বিয়ের সম্বন্ধ করলুম, শেষ পর্যন্ত ও নিজেই পিছিয়ে যায়—

ডাক্তাররা কী বলেছেন?

ডাক্তাররা ছাই জানে। তারা শুধু ঘুমের ওষুধ দেয়। সারাজীবন ঘুমের ওষুধ খাবে? দু'একজন ডাক্তার বলেছে, এ রোগ একসময় আপনি আপনি সেরে যায়। আপনি বলুন, তার ওপর নির্ভর করা যায়?

তারপর?

বাবা, আপনি ওকে দয়া করুন। আপনি ওকে আশীর্বাদ করে যদি কোনো ওষুধ দেন...

যোগানন্দ গলার স্বর আরও চড়িয়ে বললেন, তারপর?

পূর্ণিমা বিচলিত হয়ে বললেন, তারপর কি সে তো সব আপনারই দয়ার ওপর নির্ভর। আপনি যা ব্যবস্থা করবেন— আমার মেয়েটাকে যাতে বিয়ে দিতে পারি।

তুই আমার কাছে কথা লুকাস? তোর মাইয়ার জন্য আমি কিচ্ছু করতে পারমু না!

পূর্ণিমা অসহায়ভাবে ঘরের অন্য মহিলাদের মুখের দিকে তাকালেন।

যোগানন্দ দৃষ্টি তীব্র করে পূর্ণিমার প্রতি স্থাপন করে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, ভুপি কে? সে একজন নিম্নশ্রেণীর লোক, চাকর কিংবা...

মা, আমি বলছি। ভুপি আমার মামার বাড়ির দারোয়ান

ছিল। আমার যখন তেরো বছর বয়েস, সেই সময় সে আমায় চুরি করে নিয়ে যায়।

পূর্ণিমা মেয়ের কথার একটু সংশোধন করে দিয়ে বললেন, তেরো নয়, এই সবে বারোতে পা দেবার সময়।

না, তেরো—

তোর মনে নেই, সেই ফাল্গুনে সবে বারো হয়েছে। ভূপিটা যে অমন নিমকহারাম শয়তান তা তো কেউ বোঝে নি। বেশ ভালো মানুষের মতো চেহারা। আমার মেয়েকে চুরি করে অবশ্য বেশীক্ষণ রাখতে পারে নি—সকালে নিয়ে পালিয়েছিল,খোঁজ পড়লো দুপুরে. আমার এক নন্দাই পুলিসে বড় চাকরি করেন, তিনি খুব সাহায্য করেছিলেন, তা নইলে কী যে হতো! সেদিনই রাত এগারোটায় ভূপি ধরা পড়ে যায় হাওড়া স্টেশনে, আমার মেয়ে সমেত।

সারাদিন আমায় অজ্ঞান করে রেখেছিল। কোথায় রেখেছিল তা জানি না।

আমরা অবশ্য মামলা-মোকদ্দমা কিছু করি নি। পুলিস ভূপিকে মারধোর দেয়, তারপর অন্য কেস দিয়ে দু'বছর জেল দিয়েছিল শুনেছি।

ঘুমের মধ্যে আমার এখনো এক এক দিন মনে হয়, আমি বুঝি অজ্ঞান হয়ে আছি, আর ভূপি আসছে আমায় তুলে নিয়ে যাবার জন্য।

ভয় নেই, মনের এ ব্যাধি সেরে যাবে।

সারবে? বাবা, আমার মেয়ে তাহলে আপনাকে শতকোটি প্রণাম জানাবে।

কতদিন পর পর এমন হয়?

কোনো ঠিক নেই। কখনো পর পর তিন-চারদিন, কখনো মাসে বড় জোর এক দিন। যখন ঘন ঘন হয়, তখন মেয়ের মুখটি শুকিয়ে একেবারে কালীবর্ণ হয়ে যায়। কত জায়গায় ওর নামে পূজো দিয়েছি।

সেরে যাবে। আমি মন্ত্র-পড়া তেল দিচ্ছি। রাত্তিরে ঘুমোবার

আগে একবার স্নান করতে হবে, তারপর বুকে পিঠে খুব ভালো করে এই তেল ডলে দিবি। একশো আটবার 'কৃপা করো কৃপাময়ী ত্রিভুবনতারিণী, তব চরণে নমামি' এই কথা উচ্চারণ করতে করতে ডলবি।

স্নান করার পর তেল মাখবো?

হ্যাঁ। সপ্তাহে একবার।

কতদিন?

যতদিন না রোগ সারে। আর একটা কথা, এসব কারুর কাছে লুকাবি না। আত্মীয়-স্বজনরা দেখিস ব্যাঁকা ভাবে এই কথা মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দেবে তোরে। চটবি না। পরিষ্কার বলবি, ভূপি আমারে চুরি কইরা নিছিল, সেটা তার পাপ—আমার পাপ না। কেমন?

বাবা, আপনি যা বলবেন, তেমনটিই হবে।

তোর সাথে না, এখন তোর মেয়ের সাথে কথা বলছি। শোন্ মা, যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবে, তাকে বিয়ের আগেই একদিন এসব কথা খুলে বলবি। সচ্চরিত্র ভদ্র পাত্র হলে ঠিক মেনে নেবে। আর যে মানবে না, পাঁচরকম প্রশ্ন তুলবে, তাকে বিয়ে করার দরকার নেই। তোর প্রকৃত স্বামী হবে তোর মায়ের মতন, তুই রাত্তিরে চেঁচিয়ে উঠলেও সে তোরে সান্ত্বনা দেবে।

পূর্ণিমা তবু জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, এখন থেকেই মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করতে পারি তো?

এক বৎসরের মধ্যে এ মেয়ের কপালে বিবাহ-যোগ লেখা আছে।

এবার নিতাই ভট্চাজ গুরুর ডাক শুনে ছোট্ট একটা নীল শিশিতে তেল নিয়ে এলো। যোগানন্দ ছিপির মুখ খুলে নিঃশব্দে মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

তারপর শিশিটা রীণার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, যেখানে স্নো-পাউডার থাকে, সেরকম টেবিলে এটা রাখিস না। ছিপি টাইট করে কাগজে মুড়ে বালিশের তলে রাখবি। ডাক্তারি ওষুধের

দাম লাগে, কিন্তু এর দাম কাউকে দেবার চেষ্টা করিস না। দাম দিলে এর গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কিছু দিতে চাইলে রাস্তার গরীব-দুঃখীরে দিস্।

মাটিতে প্রণামের জন্য মাথা ঠেকিয়ে মা আর মেয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর কালীমূর্তির সামনে গিয়ে আরেকবার প্রণাম করলো। পূর্ণিমা ব্যাগ খুলে একটি দশ টাকার নোট রাখলেন প্রণামীর থালায়। দ্বিতীয়বার চিন্তা করে আর একটি দশ টাকার নোট। তাঁর মুখে একটা বিহ্বল ভাব। রীণারও মুখটা যেন অনেকটা বদলে গেছে।

যোগানন্দ আবার অন্য এক মহিলার কথা শুনতে লাগলেন। মানুষের সমস্যার কথা শুনতে তাঁর কোনো ক্লান্তি নেই। অধিকাংশ মানুষই নিজের সমস্যার ভার একা বইতে পারে না। গোরুর গাড়ির চাকা একসময়ে গভীর কাদার মধ্যে আটকে গেলে গাড়োয়ান কিছুতেই ঠেলে তুলতে পারে না গাড়ি, অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকায়। সেই সময় কোনো অচেনা পথচারী তার সঙ্গে একটু কাঁধ লাগিয়ে ঠেলে দিলেই গাড়ি আবার চলতে শুরু করে। যোগানন্দ সেই অচেনা পথচারী।

সকলের সব সমস্যারই যে সমাধান করতে পারেন যোগানন্দ তাও তো নয়। সবচেয়ে মুস্কিল হয় অবুঝদের সমস্যা নিয়ে। যারা নিজেদের সমস্যাটা যে কী সেটাই ঠিকমতন বোঝে না, তাদের জন্য কেউ সাহায্য করবে কী করে? কারুর হয়তো জীবনটাই শূন্য হয়ে গেছে, তবু সে সামান্য একখণ্ড জমি নিয়ে বিবাদটাকেই বড় বলে মনে করে। এইরকম মানুষের সংখ্যাই তো বেশী।

দু-একজনের সমস্যা অবশ্য অতি কঠিন ধরনের। যোগানন্দ নিজের বুদ্ধিতে তার কূল পান না। তখন তিনি তাকে দু-একদিন পরে আসতে বলে নিজে কালীমূর্তির সামনে বসে সেই সমস্যার উত্তর জানতে চান।

যোগানন্দ জানেন যে তিনি সাধনার কোনো উচ্চস্তরে এখনো উন্নীত হন নি। তাঁর দিব্যচক্ষু নেই। মা কখনো তাঁকে সামনাসামনি

দেখা দেন নি। তবু যেন একটা কিছু আছে। মাকে একাগ্রভাবে অনেকক্ষণ ধরে ডাকলে মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎঝলক হয়। প্রত্যেকদিন না, এক এক দিন। সে দিনগুলি বড় আনন্দের। সেই বিদ্যুৎঝলকের তীব্র আনন্দের স্বাদ পাবার আশাতেও প্রতিদিন ধ্যানে বসতে হয়। প্রথাসম্মত ভাবে সাড়ম্বরে নিয়মিত কালীর পুজাও তিনি করেন না। তাঁর ধ্যানই পূজা।

সকালে তিনখানা হাতে-গড়া রুটি, খানিকটা পেঁপে বা লাউয়ের তরকারি এবং বড় একবাটি দুধ খান যোগানন্দ, রাত্রে শুধু একখানি রুটি ও দুধ। একসময় তিনি মাছ-মাংস সবই খেতেন, যখন তাঁর স্ত্রী ছিল, সংসার ছিল। আরপুলি লেনে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। যোগানন্দ নিঃসন্তান, তাঁর স্ত্রী গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে আত্মহত্যা করেন। সে জীবনের কথা যোগানন্দর আজকাল কদাচিৎ মনে পড়ে।

স্ত্রী বিয়োগের পর থেকেই যোগানন্দ রাত্রি জাগতে শুরু করেছিলেন। এখন এটা তাঁর একটা নেশা। তাঁর আর পাহাড় কিংবা জঙ্গলে যাবার দরকার নেই সাধনার জন্য, রাত্রির নিস্তব্ধতাই তাঁকে সবকিছু দেয়। কলকাতার মতন ব্যস্ত, অতি জনবহুল এবং উৎকট শব্দময় শহরের রাত্রির স্তব্ধতা যেন বড় বেশী প্রকট, বেশী নির্জন।

বিশ্বদেবকে ভুল কিছু বলেন নি যোগানন্দ। তিনি যেন সত্যিই এই রাত্রির নির্জনতা তাঁর শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে শোষণ করে নেন। সেইজন্যই সকালবেলা তিনি খুব প্রফুল্ল বোধ করেন, সারা রাত ঘুমিয়েও মানুষ এত সুস্থ বোধ করে না।

রাত আড়াইটের সময় যোগানন্দর মনে হলো, তাঁর চোখের সামনে একটা অন্ধকারের পর্দা। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।

কিন্তু এ রকম তো হতে পারে না। তাঁর ঘরে হ্যাজাক বাতি জ্বলে। যোগানন্দ বিস্মিত হয়ে চোখ রগড়ালেন। তবু অন্ধকার যায় না। অন্ধকারটা তাঁর চোখের সামনে পর্দার মতন দুলছে, কোণে কোণে একটু একটু আলো। তারপর একসময় পর্দাটা সরে

গেল, যোগানন্দ দেখলেন, ঘরটা নীল আলোয় ভরে গেছে, তার মধ্যে একটি ছায়ামূর্তি।

যোগানন্দ একবার ভাবলেন, তাঁর কি তন্দ্রা এসেছে, তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন? চোখ মুছলেন আবার। এখনো সেই আলো, সেই ছায়ামূর্তি।

মূর্তিটি এক তরুণীর। শুধু একটা পাতলা শাড়ি পরা, পিঠের ওপর চুল খোলা। ছায়ামূর্তির পা মাটি স্পর্শ করে নি, যেন বাতাসে ভাসছে, দুলছে একটু একটু, ঠোঁটে স্নেহময় হাসি। তরুণী মূর্তি তাঁর বুকের ওপর হাত দুখানি এমন ভাবে রাখলো, যেন কোনো অদৃশ্য শিশুকে আদর করছে।

যোগানন্দ বলে উঠলেন, মা!

দৃষ্টিবিভ্রম নয়, সত্যি সত্যি দেখা। যোগানন্দ চোখ ফিরিয়ে চারপাশে দেখলেন। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র ঠিক ঠিক জায়গায় আছে, মেঝেতে একপাশে তাঁর বিছানাটি গোটানো, একটি বেতের স্যুটকেস, তার ওপরে ধূপদানি।

তিনি আবার তাকালেন, ছায়ামূর্তি এখনো তার বুকের অদৃশ্য শিশুকে আদর করছে আর মাঝে মাঝে সুধামাখা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে যোগানন্দের দিকে।

যোগানন্দ আবার বললেন, মা!

তরুণী মূর্তি যোগানন্দর দিকে তাকিয়ে কী যেন বললো। যোগানন্দর অন্তরাত্মা মুচড়ে উঠলো। এ যেন সত্যিই সন্তানের প্রতি মায়ের আহ্বান।

নিজের মাকে কখনো চোখে দেখেন নি যোগানন্দ। কোনো ছবিও নেই, তাঁর মাকে কেমন দেখতে ছিল তা তিনি জানেন না। এই তাঁর মা? এতদিন যাকে দেখার প্রতীক্ষায় ছিলেন? কিন্তু তাঁর মতন বৃদ্ধের এরকম তরুণী মা! তা তো হবেই, মৃতদের কখনো বয়েস বাড়ে না, তাঁর তরুণী মা চিরকালের তরুণী।

যোগানন্দ উন্মাদের মতন আসন ছেড়ে উঠে ছুটে যেতে গিয়েও আবার ধপ করে বসে পড়লেন। তাঁর বুকের মধ্যে দুম্‌দুম্‌ শব্দ

হচ্ছে। ভগ্ন ভয়ার্ত গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে?

যোগানন্দ চোখ ঢেকে ফেললেন। মনের এ কি রহস্যময় খেলা! মাতৃমূর্তি বলে যাকে দেখছেন, তাঁর মুখখানি যে খুব চেনা। এ যে সেই আরপুলি লেনের বাড়ির একতলার ভাড়াটে চক্রবর্তীবাবুর বড় মেয়ে কল্যাণীর মুখ। অবিকল। স্মৃতির কোন্ অতল থেকে উঠে এলো এই মুখ এবং কেন তা যোগানন্দর মায়ের ছদ্মবেশে?

একটা কান্নার আওয়াজ শুনে যোগানন্দ চোখ খুললেন।

সেই ছায়ামূর্তি নেই। ঘরের মধ্যে অপ্রকৃত নীল আলো নেই, হ্যাজাকটা জ্বলছে। কিন্তু কান্নার আওয়াজ তখনো শুনতে পাচ্ছেন, নারীকণ্ঠের কান্না।

যোগানন্দর সমস্ত রোমকূপ শিহরিত। একবার ভাবলেন, তিনি কি পাগল হয়ে যাচ্ছেন? এ ধরনের যুক্তিহীন জিনিসকে তো তাঁর মন কখনো প্রশ্রয় দেয় নি।

কান্নাটা থামে নি। একটু সচেতন হবার পর যোগানন্দ খেয়াল করলেন, কান্নার শব্দটা আসছে ঘরের বাইরে থেকে।

যোগানন্দ সাধারণত রাত্রে আসন ছেড়ে ওঠেন না। কিন্তু কোনো নিয়মই তাঁর জীবনে অনড় নয়। তিনি উঠে গিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

না, এটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার নয়। বাইরের ফুটপাথ থেকে আসছে আওয়াজটা। একটি মেয়ে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। শুনলেই বোঝা যায়, এটা কারুর একলা, নিঃস্বতার কান্না।

আসনে ফিরে এসে যোগানন্দ ডাকলেন, নিতাই?

চোখ মুছতে মুছতে নিতাই এসে বললো, চা করে দেবো, গুরুদেব?

ছ্যাখ তো বাইরে কে কাঁদে?

কই, কেউ না তো! এখন কে কাঁদবে?

শুনতে পাস না? তুই কালা নাকি? ভালো করে শোন!

হ্যাঁ, কাঁদছে বটে। ভিখিরি-টিখিরিদের কেউ হবে বোধ হয়।

কে কাঁদে দেখে আয়।

নিতাই বাইরে বেরিয়ে গেল।

নীল আলোর মধ্যে ছায়ামূর্তিটি দেখে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যোগানন্দ। বুকের মধ্যে এখনো শব্দ হচ্ছে। একটু অন্যমনস্ক হবার জন্য তিনি বেতের বাক্সটা খুলে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরালেন।

নিতাই ফিরে এসে বললো, ঐ যে কুসুমী বলে একটা মেয়ে আছে, কাঁদছে সে!

কেন, এত রাত্রে কাঁদছে কেন?

তা তো জানি না। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না।

ওর যদি ক্ষুধা পেয়ে থাকে, ওকে কিছু খাবার দিয়ে আসো।

তা মনে হয় না ··এত রাত্রে, ওর পায়ে একটা ঘা আছে তো, বোধ হয় সেই ব্যথায়।

যোগানন্দ অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন, তিনি নিতাই ভট্চাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু কোনো কথা শুনতে পাচ্ছেন না। বাইরে কান্নার শব্দও থেমে গেছে।

নিতাই ভট্টাচাজ একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, গুরুদেব, চা করে দেবো?

কোনো উত্তর নেই।

নিতাই তবু চা করতে গেল এবং খানিক বাদে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে বাক্যব্যয়ে রেখে গেল যোগানন্দর পাশে।

চা জুড়োতে লাগলো এমনি এমনি।

যোগানন্দ তাকিয়ে আছেন দেওয়ালের দিকে, কিন্তু তিনি ফিরে যেতে চাইছেন কিছুক্ষণ আগেকার দৃশ্যটিতে। সে দৃশ্য আর চোখের সামনে ভাসছে না, তবু দেখতে পাচ্ছেন তিনি। সেই অপার্থিব নীল আলো, একটি যুবতীর ছায়ামূর্তি, যোগানন্দ তাকে নিজের মা মনে করেছিলেন, আপনা থেকেই তাঁর মুখ দিয়ে মা ডাক বেরিয়ে এসেছিল। অথচ সেই যুবতীর মুখ আরপুলি লেনের চক্রবর্তীদের মেয়ে কল্যাণীর মতন। আবার তারপরই একটি যুবতী মেয়ের কান্না। এই তিনটি ব্যাপারের মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? এ

যেন একটা কোনো ধাঁধার ছবির তিনটি উল্টোপাল্টা টুক্‌রো।

কেন এমন হলো, কেন এই দৃশ্য দেখলেন, সে কথা মায়ের কাছে ধ্যানে বসে জিজ্ঞেস করতে হবে। আজই, এখনি ? না থাক্, কাল।

যোগানন্দ দারুণ ক্লান্তি অনুভব করলেন। শরীরে নয়, মনে। সেই জন্যই, অনেকদিন পর নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়লেন আসনের ওপরেই। এবং ঘুমিয়ে পড়লেন অবিলম্বে।

॥ ৬ ॥

মীর সাহেবের পায়ের সাদা কেড্‌স জুতো কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। একঘেয়ে বৃষ্টি পড়ছিল বিকেল থেকে। মীর সাহেব বস্তির মুখের টিউবওয়েলের জলে জুতোজোড়া ধুলেন ভালো করে. তারপর সে দুটি খুলে হাতে ঝুলিয়ে এলেন ভেতরে।

বস্তির আবহাওয়া আজ থমথমে। কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না পারতপক্ষে। সকাল থেকে পুলিস যাতায়াত করেছে অন্তত তিন চার বার। মাছওয়ালা পাঁচু খুন হয়েছে কাল রাত্রে।

এখানে নয় অবশ্য, পাঁচুর লাশ পাওয়া গেছে রেল লাইনের ধারে। পুলিস এসে তবু বস্তির প্রতিটি ঘর তল্লাশি করেছে, জেরা করেছে সবাইকে।

এই সব খুনের ব্যাপারে পুলিসের খুব একটা উৎসাহ থাকে না। পাঁচু কী ধরনের লোক ছিল, তা পুলিস ভালোভাবেই জানে। শুধু মাছ বিক্রি করেই অনেকে বিঘের পর বিঘে জমি কেনে আর হাতে দুটো তিনটে সোনার আংটি পরে! কিন্তু পাঁচুর লোভ আরও অনেক বেশী ছিল। যারা রাতের অন্ধকারে গোপন কারবার করে, তাদের শরীরের মধ্যে অনবরত জমতে থাকে তেজ। মাঝে মাঝে সেই তেজ হঠাৎ দমকাভাবে ফেটে বেরোয়, নিজেদের দলের মধ্যেই একজন কারুকে না মারতে পারলে সেই তেজের নিবৃত্তি হয় না। পুলিস ওদের চেনে, তাই এসব ক্ষেত্রে খুনীকে ধরবার জন্য কোনো ব্যস্ততা থাকে না। তা ছাড়া, পাঁচুর মতন লোকের পক্ষ নিয়ে পুলিসকে ঘাটাঘাঁটি করারও তো কেউ নেই। শুধু নিয়ম-

মাফিক পুলিস একটু ধমকাধমকি করে যায়, দু-চারজনের ঘাড়ে রদ্দা মারে, একজন বা দু'জনকে হাজতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখে।

মীর সাহেব একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতেই সে ঘর থেকে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে বললো, চৌধুরীবাবা, আজ তুমি চলে যাও, পুলিস তোমাকে দেখলে তকরার করবে।

পুলিসের চোখে মীর মশারফ চৌধুরীর সঙ্গে এই বস্তির লোকজনের সম্পর্ক খুব দুর্জ্ঞেয় বলেই মনে হওয়া সম্ভব। তাঁকে এখানে ঘোরাফেরা করতে দেখলে পুলিস হয়তো ছাড়বে না।

মীর সাহেব পাঁচুর মৃত্যুর ঘটনাটি সংক্ষেপে শুনলেন। সব ব্যাপারেই তিনি এমন শান্ত যে পাঁচুর মৃত্যু এবং পুলিসের খবর শুনেও তেমন বিচলিত বোধ করলেন না।

তোমার ছেলেটি কেমন আছে মা? তার জন্য কয়েকটা বিস্কুট এনেছিলাম।

স্ত্রীলোকটির বারো বছরের ছেলের টাইফয়েড দেখে গিয়েছিলেন গত সপ্তাহে। সেইজন্য মীর সাহেব উদ্বেগ বোধ করছেন। কিন্তু ছেলেটির জ্বর ছাড়া মাত্র সে চায়ের দোকানের কাজে আবার যোগ দিয়েছে। মীর সাহেব ছেলেটিকে অন্তত দিন পনেরো বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। ছেলেটি কাজে বেরিয়ে গেছে শুনে তিনি ভাবলেন, ছেলেটি যেমন রোগা প্যাংলা, ও সারাজীবন ঐ রকমই থেকে যাবে। যদি ওর সারাজীবন দীর্ঘ হয়।

শিয়ালদা থেকে কেনা খবরের কাগজে মোড়া হাতে তৈরি বিস্কুটের ঠোঙাটি বার করে তিনি স্ত্রীলোকটির হাতে দিলেন।

স্ত্রীলোকটি তার ঘরের দাওয়া ছেড়ে বাইরে এসে প্রথমে বিস্কুটের ঠোঙাটি নিল, তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, চৌধুরীবাবা, আপনিও কি পুলিসের লোক? দু'একজন বলছিল...

মীর সাহেব হাসলেন।

পাঁচুই কয়েকবার মীর সাহেব সম্পর্কে কটুকাটব্য করেছে। সে-ই বলেছিল, ঐ লোকটা এখানে আসে কেন, মতলোব ছাড়া

কেউ এমনধারা বিস্কুট-লজেঞ্জুস বিলোয়? ব্যাটা নির্ঘাৎ কোনো মামা!

নিয়মিত ছদ্মবেশী গোয়েন্দা পাঠাবার মতন কোনো যোগ্যতাই এই বস্তিটি অর্জন করে নি। পাঁচুর মতন দু'একটি চুনোপুটি চোলাই কারবারীদের নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন সময় কারো নেই। হিন্দী সিনেমা দেখে এইরকম একটা ধারণা অনেকের হয় যে বস্তির মধ্যে থাকে গোপন অপরাধ-চক্রের আস্তানা, মাটির তলায় ঘর ধোঁয়ায় ভরে থাকে, গলায় রুমাল বাঁধা মোটা মোটা লোকেরা হাতের ছুরি টেবিলে গেঁথে সেখানে বসে মদ্যপান করে আর অর্ধনগ্না মেয়েদের নাচ দেখে, আর সেই সব মেয়েদের ভুরুর রেখাও শয়তানের সহচরীর মতন। একসময় সেখানে হুড়মুড় করে এসে পড়ে পুলিস।

কিন্তু এই বস্তিটিতে নেহাতই হেজিপেঁজি ধরনেরঝি-চাকর, ছুতোর মিস্তিরি, রাজমিস্তিরি ধরনের লোকের বাস। পাঁচু ছাড়া আর একটিমাত্র উঠতি মাস্তান আছে এখানে, যে ইতিমধ্যেই দুবার পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। এমন জায়গায় প্রতি সপ্তাহে কোনো ছদ্মবেশী গোয়েন্দা পাঠানোর চিন্তাও হাস্যকর।

মীর সাহেব যে-ঘরে এসে রোজ ওঠেন, সে ঘরটি আজ তালাবন্ধ, ওরা কেউ নেই। মীর সাহেব খবর নিয়ে জানলেন যে, না, ওদের পুলিসে ধরে নিয়ে যায় নি। এমনিই কোথায় বেরিয়ে গেছে। মীর সাহেবের আজ আসার কথা জেনেও ওরা থাকলো না! সেজন্য অবশ্য মীর সাহেব একটুও দুঃখিত হলেন না।

ফেরার পথে তিনি দেখলেন অন্নদাকে। সে কাজ সেরে ফিরছে। তাকে দেখে মীর সাহেব আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, তাঁর মুখে একটা অপরাধবোধের ছায়া পড়লো।

কুসুমীর জন্য একটা মলম এনেছিলাম, ফুরফুরা শরীফের এক ফকির সাহেব দিয়েছেন, খুব কাজ হয়।

ওর আর কিছু হবে না, চৌধুরীবাবা। ও মলম আপনি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিন।

ছি ছি, অমন কথা বলতে নেই!

মানুষের ভাগ্য কেউ কি বদলাতে পারে? আপনি পারেন?

দুজনে চোখাচোখি করে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর অন্নদা পাশ কাটিয়ে চলে এলো বস্তির দিকে। তার সংসারের অনেক কাজ বাকি আছে।

বস্তি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে মীর সাহেব পকেট থেকে একটি জার্মান-সিলভারের কৌটো বার করে তার থেকে একখিলি পান মুখে পুরলেন। তাঁর মুখখানি বড় বিষণ্ণ উদাস।

ঠিক দু'মাসের একটি শিশুসন্তান কোলে নিয়ে বাস থেকে নেমেছিল কুসমী। তখনই তার এক পায়ে দগদগে ঘা। আগে এখানে বাস-স্টপ ছিল না, এখন রাস্তার ওপরে ঐ জবরদখল কালী-মন্দিরের সামনে বহু নারীপুরুষ নামে বলে সব বাসই থামে। কুসমীর তখন একেবারেই হাঁটার ক্ষমতা ছিল না, তাই বাস থেকে নেমে সন্তান কোলে নিয়ে মন্দিরের দর্শনার্থীদের ছাউনিতেই সে আশ্রয় নিয়েছিল।

কুসমীর বিবাহিত জীবন সার্থক হতে পারে নি, তার জন্য ঠিক যে কে দায়ী তা সে নিজেই জানে না।

তার ড্রাইভার স্বামী অত্যন্ত মাতৃভক্ত। সেই মা কুসমীকে প্রথম দিন থেকেই অপছন্দ করেছিল এবং তার কয়েকটি নিজস্ব গ্রাম্য যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল।

ছোট ছোট শ্রেণীবিভাগগুলি এখনও এত প্রখর যে তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ কথা নয়। কুসমী দাসী-শ্রেণীর মেয়ে, সে উঠতে চেয়েছিল ড্রাইভার-শ্রেণীতে, বস্তি ছেড়ে সে হতে গিয়েছিল গ্রামের একটি সাজানো সংসারের বধূ। সুতরাং সাধারণ নিয়মেই প্রতিহত হলো।

কুসমী শুধু এক বাড়ির দাসী ছিল তাই নয়, তার চেয়েও বড় কথা, সেই বাড়ির বাবুরা ধুমধাম করে তার বিয়ে দিয়েছে। কেন? কুসমীর শাশুড়ী এই ব্যাপারটা গোড়া থেকেই অপছন্দ করেছে এবং কুসমীকে বার বার এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। বাবুদের এত আদিখ্যেতা কেন, অথবা এত গরজই বা কেন? কুসমী নিশ্চয়ই

কোনো বাবুর সঙ্গে লটঘট বাধিয়েছিল। শহরে তো এরকম কত কিছুই হয়।

কুস্মীর ড্রাইভার স্বামীর মায়ের ধারণা, শহরের সব মেয়েই দুশ্চরিত্রা। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে কুস্‌মী শাড়িটা পাড়ে খুলে রেখে শুধু ব্লাউজ ও শায়া পরে স্নান করেছিল দু'দিন। এটাও তো দারুণ বেলাল্লাপনার লক্ষণ।

আরও একটা বড় কথা এই যে, কুস্‌মীর শাশুড়ীর ড্রাইভার পুত্রের বিয়ে এই গ্রামদেশে দিলে তার জন্য প্রচুর বরপণ, গয়না, এমন কি কিছু জায়গাজমিও পাওয়া যেত। ড্রাইভার ছেলে অতি সুপাত্র। তার জন্য চাই কি সোনার বোতাম চাওয়াও এমন কিছু না।

সুখেন্দু কুস্মীকে বিয়ে করে টাকাপয়সা, সোনাদানা কিছু তো আনেই নি, এনেছে এক কালো-কোলো, দেখলেই সন্দেহ হওয়ার মতন স্বাস্থ্যের মেয়ে এবং একগাদা শাড়ি। এত শাড়ির বাহার দিয়ে হবে কী?

সুখেন্দু সারা সপ্তাহ বাড়ি থাকে না, সেই সুযোগে তার মা মনের সুখে আশ মিটিয়ে বউয়ের উপর অত্যাচার করে। কুস্‌মী সব সময় হাসি-হাসি মুখ করে থাকে, এটাও তার একটা দোষ। তার শাশুড়ী সব সময় ঠেস দিয়ে বলে, এঃ, বাবুদের বাড়ির ঝি, তার রকমসকমই আলাদা, ঠ্যাকার-ঋাকার দেখলে গা জ্বলে যায়। তোর বাবু সাত-তাড়াতাড়ি করে তোর বিয়ে দিতে গেল কেন, অ্যাঁ? মাগো, ঘেন্না-ঘেন্না, ঝিয়ের মেয়ে কিনা বাড়ির বৌ! লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না।

কুস্‌মীর শাশুড়ীই একটা জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ দিয়ে একদিন তার পায়ে মেরেছিল কিংবা কুস্‌মীই আগুনের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে কুস্‌মীর পায়ের ঘা-টির গোড়া থেকেই কোনো চিকিৎসা হয় নি। এক-একজন এক-একটা গাছগাছালির কথা বলে, সেই সব পাতা থেঁতো করে লাগানো হয়, তাতে দিন দিন ঘা-টা বাড়তে থাকে। কুস্‌মীর শাশুড়ীর চোখে এটাও একটা অপরাধ! কত লোকের কত আগুনে পোড়া ঘা এমনি

এমনি সেরে যায়, আর এ মেয়ের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। এখন কি গুচ্ছের টাকা খরচ করে ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হবে নাকি? পাড়ার বিষ্ণুদাস মোহান্ত সবাইকে এক টাকায় ওষুধ দেন, সেই ওষুধই চলছিল।

কুস্‌মীর স্বামী স্টেট বাসে চাকরি পাওয়ার পর আর প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসতে পারে না। তাকে ওভারটাইম খাটতে হয়। যখন বাড়ি আসে, সে খুবই ক্লান্ত, মা ও বৌয়ের ঝগড়ার মধ্যে সে মাথা গলাতে চায় না, সে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে চলে যায় রেল লাইনের পাশের খালে। সেখানে জলে বঁড়শি ফেলে সে ঘুমোয়।

কুস্‌মীর সন্তান হলো নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগে। আট মাসের মধ্যেই সন্তান হওয়া এমন কিছু অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়, তাছাড়া বিয়ের আগেই সুখেন্দুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কিন্তু কুস্‌মীর শাশুড়ী চোখ কপালে তুললেন। ফ্ল্যাটবাড়ির বাবুরা নিজেরা গরজ করে কুস্‌মীর বিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গটা আবার উঠলো। কুস্‌মীর আঁতুড় অবস্থাতেই তার শাশুড়ী তার মৃত্যুকামনা করলো অনেকবার।

এবং আঁতুড় থেকে বেরোবার পরই শাশুড়ী আর একটি বিরাট আবিষ্কার করলো। ছেলে তো বাপ-মা কারুরই মুখ পায় নি! এ মুখ সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ ছেলে কোথা থেকে এলো!

এরপর ঝগড়াঝাঁটি উঠলো তুঙ্গে। শান্তশিষ্ট কুস্‌মীও এখন উত্তর দিতে ছাড়ে না। মার খাবার সময় সেও ফিরে মারতে যায়। আর সেই সময় উঠোনে চ্যাটাইয়ের ওপর রোদ্দুরের মধ্যে শায়িত শিশুটি চিলকান্না কাঁদে।

এই ঝগড়া একদিন অসহ্য বোধ হলো সুখেন্দুর। বাড়িতে সে আসে বিশ্রাম নিতে, তার মধ্যে এ কি উপদ্রব? প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সে কুস্‌মীর ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে বলে, দূর হয়ে যা! তোর মুখ আর আমি দেখতে চাই না!

কুস্‌মী মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে, তবু ফিরে আসে একটু বাদে। কারণ সে তার ছেলের কান্না শুনতে পেয়েছে। (মাতৃত্ব

জিনিসটাকে যতই মহিমান্বিত করা হোক, আসলে তার মধ্যে রয়েছে একটা পাশবিক ইনসটিংকট। ঐ টান ছাড়ানো মাত্র স্বল্প কয়েক-জনের পক্ষেই সম্ভব। সন্তানের জন্য কুসমী লাথি-ঝাঁটা খেয়ে থাকতেও রাজি।

শেষ পর্যন্ত সুখেন্দুর মা যখন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করলো, ও বৌ বাড়িতে থাকলে সে আর কিছুতেই জলস্পর্শ করবে না, তখন সুখেন্দু পত্নী ত্যাগ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। এ ব্যাপারে তার বিবেকের কাছেও একটা বহুকাল প্রচলিত যুক্তি তৈরি আছে: বৌয়ের বদলে বৌ পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের বদলে কি আর মা পাওয়া যায় কখনো? তা ছাড়া মায়ের নামেই এ বাড়ি-জমি, মাকে তো আর ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেওয়া অতি সহজতম কাজ।

এ দেশে অনেক রকম আইন আছে। কিন্তু আইনের লম্বা হাত শতকরা কুড়িজনের বেশী মানুষের মধ্যে পৌঁছোয় না। বাকি লোকেরা চলে নিজস্ব নিয়মে। শক্তসমর্থ পুরুষ পছন্দ না হলে বৌকে ত্যাগ করবে কিংবা বাপের বাড়িতে ফেলে রেখে আসবে, আর নেবে না, এতে বাধা দেবার কেউ নেই।

ছেলেসমেত কুসমীকে বাসে তুলে দিয়ে টিকিট কেটে দিয়ে সুখেন্দু বলেছিল, ফের কোনোদিন এখানে এলে—তাহলে সেদিনই তোর শেষ দিন হবে!

বাস থেকে নেমে কালীমন্দিরের সামনের চত্বরে বসেছিল কুসমী, সে কারুর কাছে আশ্রয়ের জন্য যায় নি। অন্নদার কাছে অবিলম্বে খবর পৌঁছেছিল। অন্নদাকে দেখে কেঁদে ভাসিয়েছিল কুসমী, কিন্তু এ কথাও সে দৃঢ়ভাবে বলেছিল, সে আর তার মাসী-দিদার সঙ্গে বস্তির ঘরে গিয়ে থাকবে না, সে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে খাবে। সে ঝি-শ্রেণী থেকে এক ধাপ ওপরে উঠতে চেয়েছিল, এখন এক ধাপ নিচে নামতে চায়।

মাসী-দিদার স্বামী কুসমীর শত্রু। যারা স্ত্রী ত্যাগ করে এবং যারা স্ত্রীর রোজগারে ঘরে বসে খায়, তারা একই ধরনের মানুষ। ওখানে

গিয়ে থাকলে কুসমীর সঙ্গে যে মাসী-দিদার স্বামীর আবার ঝগড়া লেগে যাবে, সেটা সে এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল। তাই সে আর ও ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চায় নি।

অন্নদা ছেলেটিকে কোলে তুলে নেয়। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে, অন্নদার কোলে উঠেই কান্না থামিয়ে ফেলেছে। তাই দেখে অন্নদার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। এ ছেলেকেও তার নিজের কাছে রাখার উপায় নেই।

দুদিন বাদে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী দীপা সেই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কালীমন্দিরের সামনে থেমে প্রণাম করতে গিয়ে দেখতে পেল কুসমীকে।

দু'চোখে নিদারুণ বিস্ময় ফুটিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, কুসমী, তুই?

মিনমিন করে কুসমী বলে, বৌদি ভালো আছেন? বাবলু ভালো আছে?

সংক্ষেপে সব কথা শুনে দীপার অন্তরাত্মা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। এ কী অসম্ভব অন্যায়! একটা ভালো মেয়ের জীবনটা এইভাবে নষ্ট হয়ে যাবে!

তুই সহ্য করলি কুসমী? তুই চলে এলি? প্রতিবাদ করতে পারলি না?

কুসমী চুপ করে থাকে।

দীপা দ্রুত চিন্তা করে। পায়ে এমন দগদগে ঘা-ওয়ালা কুসমীকে নিজেদের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া যায় না। অথচ এইরকম ভাবে তো মেয়েটাকে মরতে দেওয়াও চলে না!

অত্যন্ত বিচলিত ভাবে বাড়িতে ফিরে এসে দুপুরবেলা দীপা তার স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করলো এই বিষয়ে। খাওয়ার পর খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ডাক্তারবাবু বললেন, চেম্বারে বেরুবার সময় আমি মেয়েটিকে একবার দেখে যাবো। হাসপাতালে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে। মেয়েটা কোথায় আছে বললে?

দীপা বললো, হাসপাতালে জায়গা পাওয়া না যায়, নার্সিং হোমে রাখতে হবে। একটা কিছু করতেই হবে ওর জন্য।

ভালো হাসপাতালেই জায়গা পেল কুস্‌মী। পেয়িং বেড। ডাক্তারবাবু নিজে এসে তাকে দেখে যান এবং তাঁর খাতিরেই অন্য ডাক্তাররা বেশী করে যত্ন নেন।

হাসপাতালে কুস্‌মী তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু দু'দিনের বেশী সেখানে রাখা গেল না। হাসপাতালের একই বিছানায় মা ও ছেলের শোওয়ার নিয়ম নেই। স্ত্রীলোকদের এক ওয়ার্ড, শিশুদের অন্য ওয়ার্ড। তা ছাড়া শিশুটি নীরোগ।

অন্নদাকে সঙ্গে করে এনেছিল দীপা, দুজনে মিলে অনেক করে বোঝালো কুস্‌মীকে। ছেলেকে এখানে রাখা যাবে না। এ কদিন অন্নদার কাছে রাখা হোক। কুস্‌মী সেরে উঠলেই তো ছেলেকে ফিরে পাবে। শেষ পর্যন্ত কুস্‌মী রাজি হলো।

সেদিন হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে বড় এক টিন দুধ দীপা কিনে দিল অন্নদাকে।

অন্নদার পাঁচ জায়গায় ঠিকে-কাজ, তবু সে দৌড়ে দৌড়ে একবার নিজের ঘরে এসে শিশুটিকে দেখে যায়। তার স্বামীর কাছ থেকে এককণা সাহায্য পাওয়া যায় না। তার বাতের অসুখ বেড়েছে, সে এখন নিজেকেই সামলাতে পারে না, তো ঐটুকু একটা বাচ্চাকে সামলাবে! শুধু শনিবার দিন মীর সাহেব এসে বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বসে হাঁটু নাচাতে নাচাতে তার কান্না সামলান।

কুস্‌মীর যখন চিকিৎসা চলছে, সেই সময় অন্নদা একদিন গিয়েছিল কালীমন্দিরের পূজারী যোগানন্দ স্বামীর কাছে।

যোগানন্দর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি কারুর কাছ থেকেই টাকাপয়সা নেন না, সুতরাং এই ভেদাভেদের প্রশ্নই ওঠে না।

বাঙ্গালোরের সাঁইবাবা কিংবা বিহারের মোহনানন্দ স্বামীর মতন মহাপুরুষরাও কখনো ধনী-দরিদ্রের বিভেদ মানেন নি, সব মানুষই তাঁদের কাছে সমান, তা বলে সমাজের উঁচুস্তরের নারী-পুরুষ আর ঝি-চাকররা একসঙ্গে এক আসরে বসে তাঁদের উপদেশ শুনছে, এটা তো আর সম্ভব হয় না। সব কিছুরই একটা মানানসই

দিক আছে। মহাপুরুষরা যে-কোনো জায়গায় থাকতে পারেন, রাজপ্রাসাদ কিংবা দরিদ্রের কুঁড়েঘর তাঁদের কাছে সমান, তবু উচ্চাঙ্গের শিষ্যদের উপরোধেই তাঁদের প্রাসাদে কিংবা বড় হোটেলে এসে উঠতে হয়।

সেইজন্য সব শ্রেণীরই আলাদা আলাদা গুরুদেব আছে। বস্তির ঝি-চাকর, মধ্যবিত্ত আর প্রাসাদবাসী, সকলেরই গুরুদেব ভিন্ন ভিন্ন। বড়লোক গরিবলোকের যেমন আলাদা চিকিৎসক।

যোগানন্দ আচার্যর যখন সবেমাত্র নাম ছড়াতে শুরু করেছে, সে সময় তিনি ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের কাছেই দেখা দিতেন। যেহেতু তিনি নিরালায় কারুর সঙ্গে কথা বলেন না, তাই কোনো বস্তির দাসী আর মল্লিকবাড়ির গৃহিণীর একই ঘরে বসার ব্যবস্থা। এখন ভিড় দারুণ বেড়েছে। প্রায়ই অনেকে এসে ফিরে যায়। সুতরাং পৃথিবীর সব জায়গায় যারা বিশেষ সুবিধে ভোগ করে, এখানেও তারাই যে আগে প্রবেশের অধিকার পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। ভালো জামাকাপড় পরা নারী-পুরুষদের ভিড় বাড়ছে দেখে ঝি-চাকর শ্রেণীর লোকেরা আর যোগানন্দর কাছে আসেও না এখন। তারাও বুঝে গেছে।

অন্নদা তবু এলো। নিতাই ভট্‌চাজের কাছে কাকুতি-মিনতি করে সে ঘরের মধ্যে ঢোকার অনুমতিও পেয়ে গেল।

আমার মেয়েটাকে আপনি বাঁচান গো, গুরুদেব! আপনি পারেন. আপনি ছাড়া আর কেউ পারবে না। হাসপাতালে গেলে কেউ জীয়ন্ত ফেরে না। বাবুরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন জোর করে!

যোগানন্দর সব মনে আছে। কয়েকদিন আগে তিনি কুসুমীকে মন্দিরের চাতালে বসে ভিক্ষে করতে দেখেছিলেন।

তখন মেয়ের বিয়ে দিতে নিষেধ করেছিলাম না আমি?

উপায় ছিল না। মেয়েটা একেবারে ক্ষেপে গেস্‌লো। বিয়ে না দিলে আরও কেলেঙ্কারি হতো।

আমি তখনই বলেছিলাম, ও বিয়ে সুখের হবে না।

নিয়তি, সবই নিয়তি।

তাই যদি হয়, আমি কি মানুষের নিয়তি খণ্ডাতে পারি?

আপনি ওকে ওষুধ দিন, আপনার আশীর্বাদে যদি সারে! হাসপাতাল দেখলেই আমার ভয় হয়—

আমার ওষুধে ওর সারবে না। যা চিকিৎসা হচ্ছে হোক।

ঠাকুরমশাই, ওর দু'মাসের বাচ্চাটা আমার কাছে। তাকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।

সকলের সব দুঃখ দূর করার সাধ্য আমার নাই, মা। এক্ষেত্রে আমি কিছু করতে পারবো না।

অন্নদার আরও নানারকম পীড়াপীড়িতেও যোগানন্দ মৌনী হয়ে রইলেন। তারপর অন্য একজন নারীভক্ত কথা বলতে শুরু করলো।

সকলের ক্ষেত্রেই যোগানন্দ কোনো নিদান দেন না। কয়েক-জনের কাছে নিজের অক্ষমতাও প্রকাশ করেন। যোগানন্দ কি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা? তিনি কি আগেই বুঝেছিলেন যে চিকিৎসায় কুসুমীর কোনো ফল হবে না?

ডাক্তাররা জানালেন যে, কুসুমীর ক্ষতস্থানটা গ্যাংগ্রীন হয়ে গেছে। এর সুদীর্ঘ চিকিৎসা দরকার। সেরকম কোনো চিকিৎসাও এর নেই। সবচেয়ে ভালো উপায়, হাঁটুর ওপর থেকে কুসুমীর বাঁ পা-টা কেটে ফেলা। সেটাই সংক্ষিপ্ত এবং উচিততম ব্যবস্থা।

যেহেতু কুসুমীর কোনো নির্ভরযোগ্য অভিভাবক নেই এবং এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, তাই কুসুমীকে না জানিয়ে কিছু করা যায় না।

পা কেটে ফেলা হবে, এই কথা শোনামাত্র কুসুমীর হৃৎপিণ্ডটা এত জোর শব্দ করতে লাগলো যে, সে অন্য কারুর কোনো কথাই শুনতে পেল না। অন্নদাও একথা জেনে গিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথার উত্তরে এরা যুক্তিপূর্ণ কোনো উত্তর দিতে জানে না, শুধু কাঁদতে জানে।

দীপা অনেক করে বোঝালো। দু'জনকেই। এত বড় বড় ডাক্তাররা যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ভালোর জন্যই বলছেন।

পা-টা কেটে বাদ দিলে, তারপর কুসমী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। তারপর ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটবে, কত লোকই তো এমন…কিংবা কাঠের পা-ও বানিয়ে নেওয়া যায় আজকাল…

সেই রাত্তিরেই কুসমী হাসপাতাল থেকে পালালো। হাসপাতালের রোগীদের আটকে রাখার জন্য তো কোনো পাহারার ব্যবস্থা থাকে না। যে চিকিৎসা করাতে চায় না, সে নিজে বুঝবে।

হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসে কুসমী অন্নদার অন্তত একটা উপকার করেছিল। অন্নদাকে দায়ভাগী হতে হয় নি।

অনাদরের শিশুদের সাধারণত প্রাণশক্তি বেশী হয়। আবর্জনার মধ্য থেকেও তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু সেই বছরই কলেরা এপিডেমিক হওয়ায় ঐটুকু ছেলে তার প্রতিরোধ করতে পারলো না। ফুটফুটে সুন্দর মুখখানি বিবর্ণ করে সে একদিন মরে গেল। এই যদি কুসমী হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসবার আগেই অন্নদার কাছে তার ছেলেটি মারা যেত, তাহলে সারাজীবন অপরাধী হয়ে থাকতে হতো অন্নদাকে।

এরপর থেকে কুসমী পাকাপাকিভাবে রাস্তার ভিখিরি হয়ে গেল।

বাড়ি থেকে বেরুতে হলে দীপা গাড়িতেই যায় বেশী। তাই কুসমীকে তার দেখতে হয় না। তবু কখনো কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে হেঁটে ফেরার সময় কুসমীর দিকে চোখ পড়ে যায়। দীপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর কী করার আছে এই মেয়েটার সম্বন্ধে, দীপা ভেবে পায় না। বেশীক্ষণ তাকিয়েও থাকা যায় না কুসমীর দিকে, ওর পায়ের ঘা-টা দেখলেই মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

কুসমী দীপা বৌদির কাছ থেকে ভিক্ষে নেয় না। দীপারও ভিক্ষে হিসেবে কিছু দিতে লজ্জা করে। একদিন সে ব্যাগ খুলে দু'টাকার নোট দিয়েছিল, কুসমী বলেছিল, না না, আপনাকে আর দিতে হবে না বৌদি। আপনি তো অনেক করেছেন আমার জন্য।

দীপা একটা পুরোনো ভালো শাড়ি পাঠিয়ে দেয়। সেটা একবারও পরার সুযোগ হলো না কুসমীর। এক রাত্তিরের মধ্যেই তার পুঁটলি থেকে চুরি হয়ে গেল।

দীপা তার স্বামীকে একদিন বললো, ঐ মেয়েটার জন্য আর কিছু করা যায় না? কোনো অনাথ আশ্রম-টাশ্রমে?

ডাক্তারবাবু একটু তেতো ধরনের হেসে বলেন, ছাখো কুস্মী যখন ভিক্ষে করতে একবার শুরু করেছে, তখন ওকে ভিখিরিই বলতে হবে। ভিখিরিদের অনাথ আশ্রম বা কোথাও রাখার নিয়ম নেই। কলকাতার সত্তর-আশি হাজার কিংবা তারও বেশী ভিখিরিকে রাখতে গেলে কতগুলো অনাথ আশ্রম খোলা দরকার ভেবে ছাখো! আমাদের দেশে সেরকম কোনো ব্যবস্থা এখনো হয় নি।

মেয়েটা ঐ রকম ভাবে পচে মরবে?

অপারেশান না করলে ওর সারবে না। কারুর ওপর জোর করে অপারেশান চালানো যায়? এমন কি ভিখিরিদের ওপরেও জোর করা যায় না। সেটা বে-আইনী। জোর-জুলুম করে একটা অপারেশান চালাতে গিয়েই তো ইন্দিরা গান্ধীর গদি উল্টে গেল!

বিশ্বদেব তখন বসেছিল সেখানে।

দীপা তার দিকে চেয়ে বলেছিল, তোমরা খবরের কাগজে লেখো না কেন এই নিয়ে? তোমরাও মেয়েটার একটা কিছু হিল্লে করতে পারো না?

বৌদি, তোমাদের এখনো ধারণা খবরের কাগজ সব কিছুর সুরাহা করে দিতে পারে। খবরের কাগজে লিখলে কী হয়? কিচ্ছু হয় না। কত কিছু সম্বন্ধেই তো লেখা বেরুচ্ছে!

তাহলে কিসে কী হয় বলতে পারো?

বিশ্বদেব ও ডাক্তারবাবু পরস্পরের চোখের দিকে তাকায় এবং পুরুষদের ভাষায় সাঙ্কেতিক কথা বলে। মেয়েরা এই পৃথিবী সম্পর্কে এখনো কত কম জানে!

কুস্মীর ব্যাপার নিয়ে সবচেয়ে বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন মীর সাহেব।

কেউ কোনো অভিযোগ করে নি, তবু কুস্মীর ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী করেন নিজেকে। কুস্মীর বিয়ে দেবার কথা তিনিই বলেছিলেন আগে। তিনি নিজে লক্ষ্মীকান্তপুরে গিয়ে

পাত্র সম্পর্কে খোঁজখবর এনে অন্নদাকে ভরসা দিয়েছিলেন। কালী-বাড়ির পূজারী বারণ করেছিলেন বিয়ে দিতে, আর মীর সাহেব উৎসাহ দিয়েছিলেন বিয়ের ব্যাপারে।

মীর সাহেবকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে তিনি মুসলমান। তিনি কতখানি এগোতে পারবেন আর কতখানি পারবেন না, তার একটা সীমারেখা আছে। তিনি শুধু পরামর্শ দিতে পারেন। সেই পরামর্শেও এমন মারাত্মক ভুল হলে তিনি একেবারে মরমে মরে যান। তাঁর বিবেকে বিঁধে আছে এক হাজার কাঁটা।

ফুরফুরা শরীফের মাজারে এক ফকিরের খুব নামডাক, তাঁর ওষুধ নিতে হিন্দু-মুসলমান ভিড় করে যায় প্রত্যেক দিন। হিন্দু মন্দিরে কিংবা হিন্দু সাধকের কাছে মুসলমানেরা আসে না, কিন্তু মুসলমান ফকিরের কাছে হিন্দুদের যাওয়ার কোনো বাধা নেই। ফকির সাহেবের মলমে নাকি অন্ধও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

মীর সাহেবের এই সব ব্যাপারে খুব একটা বিশ্বাস নেই, তবু নিরুপায় হয়ে তিনি নিজে গিয়েছিলেন ফুরফুরায়। দারুণ বিপদের সময় মানুষ যে-কোনো কিছুই আঁকড়ে ধরতে চায়। ফকির সাহেবকে দেখে মীর সাহেবের মনে হয়েছিল, লোকটির মধ্যে এক ধরনের দিব্য-উন্মাদনা আছে। একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফকির সাহেবকে কুসুমীর বৃত্তান্তটি খুলে বলায় তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেরে যাবে।

ফকির মলম দিয়েছিলেন কলাপাতায়। সেভাবে এত দূর আনা যায় না। একটা খালি জুতোর কালির কৌটো খুব ভালো ভাবে ধুয়ে, তার মধ্যে মলমটা নিয়ে এসেছেন তিনি।

অন্নদার কথা শুনে আরও একটু আঘাত পেলেন মীর সাহেব। কিছুদিন ধরে অন্নদা একেবারে বদলে গেছে। সেই মুখরা, তেজী, খাঁটি টাইপ ঝি-চরিত্রটি আর নেই, এখন নিষ্প্রাণ, একটা যন্ত্র-পুতুলের মতন। টাকা রোজগারের জন্য কাজ করতে হয় তাই কাজ করে, খেতে হয় তাই খায়। কিন্তু বোঝাই যায় তার জীবনে আর কোনো স্বাদ নেই।

মানুষের এই অবস্থাটা মীর সাহেব কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না, তাঁর কষ্ট হয়। বৃহৎ কোনো দর্শন কিংবা মহৎ কোনো বাণী তাঁর নেই, তিনি তাঁর চেনা মানুষদের শুধু একটাই কথা বলতে চান, আশা ছাড়তে নেই কখনো।

অন্নদা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। মীর সাহেব বিষণ্ণ মনে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন। একসময় তিনি এসে দাঁড়ালেন কালী-মন্দিরের সামনের রাস্তায়। পকেটে হাত দিয়ে জুতোর কালির কৌটোটা তিনি চেপে ধরলেন।

ফুটপাথের ছাউনির নিচে বসে আছে কুসুমী। সে হাত পেতে ভিক্ষে চায় না, তার বদলে তার ঘেয়ো পা-টা ছড়িয়ে রাখে সামনে। ঐ পা-টা ছাড়া কুসুমীর বাকি শরীরে এখনো যৌবন আছে। তার ঐ পায়ের দিকে কেউ এক পলকের বেশী চোখ রাখতে পারে না। কিন্তু রাত্তিরে সে ঐ পায়ের ওপর যখন একটা চট চাপা দিয়ে রাখে, তখন তাকে অন্যরকম দেখায়। কোনো কোনো দিন শেষরাত্রে ফুটপাথবাসী দু-একটি ছোকরা উন্মাদ হয়ে ওঠে হঠাৎ। অন্য রকম খিদের জ্বালায় ঘুমন্ত কুসুমীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে খেতে চায়। কুসুমী প্রাণপণ শক্তিতে তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য লড়ে, শেষ পর্যন্ত না পারলে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তাতেই সে জিতে যায়। কুসুমী জানে সমস্ত শহরের মধ্যে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ।

যদিও রাস্তাটা সর্বসাধারণের জন্য, কিন্তু মন্দিরের দু-পাশে ফুটপাথ যতখানি বাঁধানো, ততটা এখন এই মন্দিরের এলাকা হিসেবে গণ্য। মীর সাহেব ওখানে যেতে পারেন না।

একটু দূর থেকে তিনি ডাকলেন, কুসুমী, ও কুসুমী!

কুসুমী মীর সাহেবের দিকে তাকালো, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না।

হয়তো একসময় তার অভিমান ছিল, এখন সমস্ত পৃথিবীর ওপর তার ঘৃণা। বিশেষত তার সন্তানটি মারা যাবার পর সে পৃথিবীর আর কোনো জীবিত প্রাণীকে সহ্য করতে পারে না।

কুসমী, একবার উঠে এসো মা !

নিভন্ত উনুনে বাতাস করলে যেমন ফুলকি ওড়ে, সেইরকম কুসমী ঘৃণার ফুলকি ছড়াতে লাগলো।

তোমার জন্য মলম এনেছি, আমি নিজের হাতে লাগিয়ে দেবো, একবার উঠে এসো।

কুসমী বুঝে গেছে যে, এখানে লক্ষ্মণের গণ্ডি কাটা আছে, এর মধ্যে ঢুকতে পারবেন না মীর সাহেব। সে-ও এর বাইরে যাবে না।

একটা ছোট ছেলেকে ডেকে মীর সাহেব কৌটোটা দিয়ে বললেন, এটা ঐ কুসমীর হাতে দাও তো বাবা !

তারপর মিনতির সুরে বললেন, খুব ভালো মলম, রোজ দুবার করে লাগাবে, দেখো সেরে যাবে।

কুসমী কৌটোটা খুলেও দেখলো না, সেটা রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিল প্রাণপণ জোরে। সেটা মাঝরাস্তা দিয়ে চাকার মতন গড়াতে লাগলো।

॥ ৭ ॥

দেখুন দেখুন বৌদি, যোগানন্দ মহারাজ ঠিক এইভাবে বসেন। দুটো হাঁটু মুড়ে, আর কথা বলার সময় ডান দিকের গালের খানিকটা জায়গা নড়ে, এই যে এরকম--

দীপা হেসে ফেলেও বলে, ছিঃ, ওরকম করতে নেই ! অতবড় একজন মানুষকে তুই ভ্যাংচাচ্ছিস ?

রীণা ভুরু উঁচু করে বললো, ওমা, ভ্যাংচালুম কোথায় ? উনি কী রকম ভাবে কথা বলেন তাই দেখাচ্ছিলুম। হঠাৎ হঠাৎ বাঙ্গাল ভাষা শুনতে এত মজা লাগে !

সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে ঠাট্টাইয়ারকি আমি পছন্দ করি না।

ঠাট্টা ? মোটেই আমি ঠাট্টা করি নি ! সিনেমায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রামকৃষ্ণদেবের পার্ট করেন, তার মানে কি তিনি রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে ঠাট্টা করেন ? উনিও তো একটা দাঁতে রং করে নেন !

পাশে বসে বিশ্বদেব কুলকুল করে হেসে যাচ্ছে।

দীপা বৌদি, এই রীণা কিন্তু সত্যি খুব ভালো নকল করতে পারে। আমি যোগানন্দ আচার্যকে খুব কাছ থেকে দেখেছি তো, ঠিক ঐরকম ভাবে। আর একবার গালটা কাঁপাও তো!

দীপা রাগ করে বললো, না, আমি ওসব পছন্দ করি না—

বিশ্বদেব বললো, রীণার কিন্তু বেশ অভিনয় করার ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশে কোনো মেয়ে কমেডিয়ান নেই। সারা পৃথিবীতেই তো নেই। ধরুন যদি চার্লি চ্যাপলিনের মতন কোনো মেয়ে, ঠিক ঐ রকম কায়দায়···

রীণা তোমাকেও নকল করে ফেলেছে, তা জানো বিশ্ব? দেখবে? একবার দেখা তো রীণা!

যে উপস্থিত থাকে, তার সামনে আমি তারটা দেখাতে পারি না!

আমার আড়ালে বুঝি খুব আমাকে নিয়ে মজা করা হয়?

বিশ্ব, তুমি কি জানো, তুমি কথা বলার সময় মাঝে-মাঝেই জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নাও!

মোটেই না।

রীণা, ঐটুকু অন্তত দেখিয়ে দে!

কলিংবেল বেজে উঠলো দরজায় এই সময়।

দীপা বৌদির ভাই রঞ্জন। সুসজ্জিত সুপুরুষ। হলঘরের মধ্যে ঢুকে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নিল। যেন একজন যোদ্ধা।

তারপর প্রথমে রীণার দিকে তাকিয়ে, প্রথাসম্মত ভাবে সামান্য হেসে, একটু ঘাড় হেলিয়ে বললো, কী, ভালো?

দীপা বৌদির দিকে তাকিয়ে বললো, ছোড়দি, তুমি এখনো তৈরি হও নি?

বিশ্বদেবের সঙ্গে কথা বলবে কিনা সে সম্পর্কে এখনো মনস্থির করে নি রঞ্জন।

দীপা ব্যস্ত হয়ে বললো, ওমা, কটা বাজে? ইস্ এর মধ্যেই এগারোটা বেজে গেল?

ব্যস্ততার থেকেও দীপার মুখে দারুণ একটা অস্বস্তির ছাপ। পর্যায়ক্রমে সে বীণা ও বিশ্বদেবের মুখের দিকে তাকালো। দীপার ধারণা, সকলেই তার মুখ দেখে সবকিছু বুঝে যায়।

তোরা একটু বোস, আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। রঞ্জনকে নিয়ে আমার ছোট মাসীর বাড়িতে একবার যাবো বলেছি, কদিন ধরে কিছুতেই আর যাওয়া হচ্ছে না।

কথাটা বলে দীপা আর একবার ওদের মুখের দিকে তাকালো। ওরা কি বুঝে গেছে যে, ছোট মাসীর বাড়ি যাওয়া হচ্ছে মেয়ে দেখবার জন্য!

রঞ্জনের আর কিছুতেই মন ওঠে না। এই নিয়ে প্রায় এগারোটি মেয়ে দেখানো হলো। হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলে না রঞ্জন, কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু কাঁধ ঝাঁকায়। আর পাঁচদিনের মধ্যেই তাকে ফিরে যেতে হবে জম্মুতে। সেখানে সে শহর থেকে অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর তাঁবুতে একলা একলা থাকে। আর্দালির হাতের রান্না খেতে হয়। আত্মীয়-স্বজনরা সবাই ভেবেছিল, এর মধ্যে কোনো পাত্রী পছন্দ করলে কথাবার্তা সব ঠিকঠাক হয়ে থাকতো, তাহলে দেড়মাসের মধ্যেই একটা বিয়ের তারিখ আছে।

কাশ্মীরের মেয়েরা সবাই সুন্দরী, তাদের দেখে দেখে রঞ্জনের আর বুঝি কোনো বাঙালী মেয়ে পছন্দ হয় না। অথচ বাংলা-কথা-বলা মেয়েই সে বিয়ে করবে, ইংরেজিতে সে প্রেমের কথা বলতে চায় না। কোনো কাশ্মীরী মেয়েকে বাংলা শিখিয়ে নিলে হয় না!

ছোট মাসীর বাড়িতে আজ যে আর একটি মেয়েকে আনা হবে রঞ্জনকে দেখাবার জন্য, সেকথা রঞ্জনকে আগে থেকে বলা হয় নি। কিন্তু ও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু আন্দাজ করেছে। নইলে ছোট মাসীর বাড়ি যাওয়ার এত গরজ কেন, দূর-সম্পর্কের মাসী, যার সঙ্গে সাতজন্মে দেখা হয় না!

শাড়ি বদলাবার সময় দীপার আরও একটা কথা মনে হলো। সে এখন বেরুবে, বীণা আর বিশ্বদেবকেও চলে যেতে হবে। এটা বড্ড খারাপ দেখায়। বেশ আড্ডা জমেছিল।

রঞ্জন আসবার আগের মুহূর্তে বসবার ঘরটা হাসির হুল্লোড়ে ভরে ছিল, এখন সবাই স্তব্ধ। তিনজনেই তিনটি বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। রঞ্জন বসে নি পর্যন্ত, দীপা তৈরি হলেই সে বেরিয়ে পড়বে।

রঞ্জন এ পর্যন্ত একটাও কথা বলে নি বিশ্বদেবের সঙ্গে। সে অভদ্র না লাজুক, তা বলা শক্ত। (অনেক সময় লাজুকতা লুকোবার জন্য মানুষ রুক্ষ হয়ে ওঠে।)

মেয়েদের তুলনায় বিস্ময়কর রকম কম সময়ে তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে এলো দীপা। রঞ্জনকে বললো, চল্।

তারপরই লজ্জিতভাবে বিশ্বদেব ও রীণার দিকে চেয়ে সে বললো, না না, তোমরা বসো না! আমি একটু বাদেই ঘুরে আসবো। তোমরা গল্প করো, শিবুকে বলছি, চা করে দেবে।

কিন্তু এমনভাবে কোনো যুবক ও যুবতী অপরের ফ্ল্যাটে সাধারণত বসে থাকে না—যদি না তাদের বেপরোয়া অবস্থা হয়।

বিশ্বদেব তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, না, আমি এবার যাবো।

দীপা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো আর দুবারই বিনীত প্রত্যাখ্যান করলো বিশ্বদেব।

তখন রীণাকে প্রস্তাব দেওয়া হলো, ওকে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দেবার। রীণা বললো, সে অন্যদিকে যাবে। কোনো এক অসম্ভব উপায়ে রীণাও কি টের পেয়ে গেছে যে রঞ্জন আবার একটি মেয়ে দেখতে যাচ্ছে!

রীণা অবশ্য ওদের সঙ্গেই বেরোলো। বিশ্বদেব ওপরে উঠে গেল তাদের ফ্ল্যাটে। বারান্দা থেকে দেখলো রঞ্জনরা ট্যাক্সি ধরে শেষবার অনুরোধ করছে রীণাকে পৌঁছে দেবার। রীণা নমস্কার করে অন্যদিকে গেল।

একটু পরেই বিশ্বদেবদের দরজায় কলিংবেলের আওয়াজ।

বিশ্বদেবের মা একটা স্কুলে পড়াতে যান এই সময়। অনেকটা শখের কাজ। টাকা জিনিসটা অবশ্য সকলের কাছেই প্রয়োজনীয়, ঈষৎ সচ্ছল পরিবারেও অতিরিক্ত চার-পাঁচশো টাকা বেশ কাজে

লেগে যায়। আবার ঐ টাকাটা তিনি উপার্জন না করলেও বিশেষ কোনো অভাববোধ হতো তা নয়। বিশ্বদেবের মা করুণা এম. এস-সি পাস, বিয়ের পর টানা পনেরো বৎসর তিনি শুধু ঘর-সংসার করেছেন। তারপর তাঁর মনে হয়েছে যে একটা ডিগ্রি যখন আছেই, তখন সেটা কাজে লাগানো যাক। তা ছাড়া সময়ও কাটে। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের বয়েস এখন তেরো, সেও প্রায় স্বাবলম্বী।

বিশ্বদেব আশঙ্কা করেছিল তার বেকার বন্ধু প্রিয়ব্রত এসেছে বুঝি। ম্যাজিক আই দিয়ে দেখলো, একটি মেয়ে। দরজা খুলে দেখলো, রীণা।

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম!

কী?

তুমি তখন আমাকে ওপরে আসতে বললে না কেন? কেন বললে না, চলো আমাদের ফ্ল্যাটে চলো!

গত তিন সপ্তাহে ওদের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, যাতে এই সুরে এরকম কথা জিজ্ঞেস করা যায়।

বিশ্বদেব একটু চিন্তা করে বললো, বলি নি···তার কারণ ছিল।

কী কারণ, জানতে পারি?

এমন কিছু নয়, পরে জানলেও চলবে।

আসলে বিশ্বদেব ফ্ল্যাটে পৌঁছেই জামা খুলে ফেলেছে বলে শুধু গেঞ্জি গায়ে রীণার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। তার চোখে মুখে চঞ্চলতা।

রীণার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ। তার মুখে একটা অপমানের ছাপ। শুধু বিশ্বদেবের ব্যবহারেই এতখানি অপমানিত হয়েছে সে? অথবা রঞ্জনের আজকের ছোটমাসীর বাড়ির অভিযানের কারণটি সে ঠিকই ধরতে পেরেছে!

তুমি আমার সঙ্গে একটু বেরুবে? তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে!

বিশ্বদেব কথা বলছিল প্রায় দরজা আটকে, এবার সে খানিকটা সরে গিয়ে বললো. হ্যাঁ বেরুতে পারি। তার আগে একটু ভেতরে

এসে বসো, এক কাপ চা খাও।

অর্থাৎ রীণাকে এটা বোঝানো দরকার যে একটি মেয়েকে, বিশ্বদেবের কোনো বান্ধবীকে এ ফ্ল্যাটে বসাবার অধিকার তার আছে। তাদের পরিবারে এ ধরনের কোনো বাধানিষেধ নেই। মা এখন বাড়ি নেই, তিনি থাকলেও তাঁর সঙ্গে বিশ্বদেব রীণার পরিচয় করিয়ে দিত। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় ঘোর দুপুরেও তার ক্লাসের কোনো কোনো মেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে এসেছে।

চা খাওয়া পর্যন্ত রীণা প্রায় কোনো কথাই বললো না। সে উতলা হয়ে আছে। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে দীপা বৌদির ফ্ল্যাটে সে যে কত কৌতুক করছিল তার কোনো চিহ্ন এখন নেই। বিশ্বদেবদের ফ্ল্যাট ফাঁকা, এখানে ইচ্ছেমতন কথা বলা যায়, তবু রীণা বাইরে বেরুতেই চাইছে।

শুধু কথা নয়, ফাঁকা ফ্ল্যাটে ইচ্ছেমতন আরও অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু রীণার সঙ্গে বিশ্বদেবের সেই সম্পর্ক এখনো আসে নি। তা ছাড়া বিশ্বদেব বিশ্বদেব, মাত্রাহীন লোভীও নয়।

বিশ্বদেব পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিয়েছে আগেই, এবার বললো, চলো, তা হলে বেরুনো যাক্।

কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে? এ ব্যাপারে পুরুষরাই জায়গা ঠিক করে। কিন্তু কোনো দোকান-টোকানে যাওয়ার মানে হয় না। একগাদা খেতে হবে, না খেলে বেশীক্ষণ কথা বলতে দেবে না! বিশ্বদেব এর আগেই দু-তিনবার দেখেছে যে রীণা কিছুই খেতে চায় না, সব খাবার তাকে একা খেতে হয়।

কলকাতা শহরে কোথায় আছে নিরালা জায়গা?

বিশ্বদেবের মনে পড়লো, এইরকম দুপুরের দিকটায় বালিগঞ্জ লেকটা ফাঁকা থাকে। বাজে ছেলেরা এই সময় বিরক্ত করতে আসে না।

বছর দু-এক আগে বিশ্বদেবের খুব মাছ ধরার নেশা চেপেছিল। দশ টাকার টিকিট কেটে লেকে ছিপ ফেলে মাছ ধরা যায়। তখন

বিশ্বদেব দেখেছিল, দুপুরের দিকে যুবক-যুবতীরা সেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে মন্থরভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

লেক বেশী দূর নয়, মিনিট পনেরো হাঁটলেই পৌছনো যায়।

কিছু বলতে হলো না, দুজনে সেদিকেই হাঁটতে লাগলো।

রীণা বলেছিল, তার একটা বিশেষ কথা আছে। কিন্তু সেরকম কোনো কথাই সে বলছে না। তার মুখের রঙ সমুদ্রে মেঘের ছায়ার মতন। আজ রঞ্জন এমন নীরস ব্যবহার করছে বলেই কি রীণার মেজাজটা এত খারাপ হয়ে গেছে? রীণা বুঝতে পেরেছে যে রঞ্জন প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে, সে কথা জানাজানি হবার আগেই রীণা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়?

লেকের ভেতরে, মসজিদের কাছে ঝুলন্ত সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করলো, তুমি যোগানন্দ আচার্যের কাছে গিয়েছিলে কেন?

এমনিই। মা জোর করে নিয়ে গেল।

তোমার মা তোমার ওপর কতখানি জোর করতে পারেন?

অনেকখানি। সব সময় জোর করতেও হয় না। মাকে আমি দারুণ ভালোবাসি। মা আমার ঠিক বন্ধুর মতন।

তুমি তোমার মায়ের একমাত্র মেয়ে।

আমার দুই দাদা আর এক ভাই আছে, কিন্তু মেয়ে শুধু আমি একটাই।

সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে বাবাদের বন্ধুত্ব হয় বেশী।

আমার বাবা তো সাধারণত বাইরে বাইরেই থাকেন। বেশী দেখাই হয় না। বাবাও আমার বন্ধু।

তোমায় একটা চুমু খাবো?

খুব বেশী অবাক হলো না রীণা। শুধু চোখ সরু করে তাকালো বিশ্বদেবের দিকে।

যাঃ। মাথাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল নাকি?

নিজের ফাঁকা ফ্ল্যাটে এ জিনিসটা খুব সহজেই সম্ভব ছিল। তখন মনে পড়ে নি, এখন এই খোলা আকাশের নিচে, জলের ওপর

দাঁড়িয়ে হঠাৎ এমন অসঙ্গত ইচ্ছে জাগলো কেন তার? হয়তো এই খোলা আকাশ এবং জলই তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিশ্বদেব চকিতে দু'পাশে তাকিয়ে দেখলো, কেউ শুনতে পেয়েছে কি-না। সেতুর নিচের জল এবং দু'পাশের গাছগুলোই শুধু শুনেছে। তারা নীরব।

তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলতে চাই।

সেটা শোনার জন্যই তো প্রতীক্ষা করছি।

তুমি কিছু মনে করবে না?

কিছু একটা মনে করবো তো নিশ্চয়ই। মানুষ কি মন কখনো ফাঁকা রাখতে পারে?

কখনো কারুকে বলি নি···অথচ না বললে···এমন একটা বোঝা···আমি তোমায় বলতে চাই।

বলো—।

প্রায় বারো বছর আগেকার কথা···এক যুগ···অথচ মনে হচ্ছে যেন সেদিন···আমার তখন ঠিক তেরো বছর চার মাস বয়েস··· আমাদের মামাবাড়ির দারোয়ান আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়··· তারপর ··

মাঝে মাঝে থেমে থেমে সত্যবাদিনীর মতন আন্তরিক গলায় বীণা বলে গেল পুরো কাহিনীটা। শেষের দিকে তার দু' চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

এতক্ষণ জল আর গাছপালা ছাড়া আর কেউ ছিল না, এখন আর এক জোড়া যুবক-যুবতী নিমগ্নভাবে কথা বলতে বলতে সেতু পার হয়ে চলে গেল মসজিদের দিকে। তবু বিশ্বদেব হাত রাখলো বীণার পিঠে এবং তাকে একটুক্ষণ কাঁদতে দিল।

তারপর বললো, শোনো—

কী?

তাকাও আমার দিকে।

বীণার অশ্রুমাখা মুখখানি দেখতে অপূর্ব সুন্দর লাগলো বিশ্বদেবের। ঐ অশ্রু তার ঠোঁট দিয়ে মুছে দেবার যোগ্য। কিন্তু

এখানে তা সম্ভব নয়। সে রুমাল বার করেও দিল না।

তারপর পুরো ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবার জন্য বিশ্বদেব বললো, এই গল্পের জন্য এত কান্নাকাটি করার কী আছে? ধুৎ! আমার কিন্তু খুবই চুমু খেতে ইচ্ছে করছে তোমায়। হে দেবী, কবে একবার অনুমতি দেবে?

রীণা ধরা গলায় বললো, এ ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা করো না. প্লীজ! আমি এখনো ভালো ঘুমোতে পারি না···আমার মনে হয় আমি নষ্ট, অপবিত্র···

শোনো, আমি একটা কথা বলি। পরশু যে আমরা থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম রবীন্দ্র সদনে, সাড়ে ছ'টার শো, আমি টিকিট নিয়ে তোমার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম বাইরে, ছ'টা পঞ্চাশেও তুমি এলে না।

আমি তো তোমায় বলেইছি, কেন দেরি হলো···

সেজন্য নয়। তোমার দেরি দেখে আমি ছট্‌ফট করছিলাম, মেয়েরা কক্ষনো ঠিক সময়ে আসে না জানি, তবু চিন্তা হচ্ছিলো ·· তুমি বলেছিলে তুমি একা ট্যাক্সি নিয়ে আসবে···হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, ট্যাক্সিওয়ালা যদি তোমায় নিয়ে পালায়? কলকাতায় এরকম সাধারণত হয় না, দিল্লিতে খুব হয়···ভাবলুম দিল্লির কোনো ট্যাক্সিওয়ালা যদি···এই চিন্তাটা আমায় পেয়ে বসেছিল···তারপর সত্যিই তুমি একা একটা ট্যাক্সিতে এলে।

আমি তো একা ট্যাক্সিতে প্রায়ই যাই।

সেই জন্যই তো। ধরা যাক, সত্যিই যদি ঐ ট্যাক্সিওয়ালা তোমায় চুরি করে নিয়ে যেত···তোমার রূপ দেখে মাথা সামলাতে না পেরে তোমায়···ইয়ে···ধর্ষণ করতো, তা হলেও তুমি আমার কাছে একই থাকতে···সুতরাং ছেলেবেলায় একজন চাকর বা দারোয়ান কী করেছিল, সেটা মনে রাখার যোগ্যই নয়।

রীণা ঠিক যেন চুম্বক-আকৃষ্টের মতন তাকিয়ে রইলো বিশ্বদেবের চোখের দিকে। সে হাত বাড়িয়ে বিশ্বদেবের হাত ছুঁলো।

তুমি সত্যি মন থেকে এ কথা বলছো?

মন বাদ দিয়ে কোনো কথা আমি বলতে পারি না। কোনো লোক যদি তোমাকে অসহায়ভাবে পেয়ে তোমার ওপর কোনো অন্যায় করে, তা হলে সেটা তারই অন্যায়, তুমি তার জন্য দায়ী হতে যাবে কেন ?

আশ্চর্য !

কী আশ্চর্য ?

যোগানন্দ স্বামী ঠিক এই ধরনের কথাই বলেছিলেন।

উনি আবার স্বামী হলেন কবে থেকে ? ওঁর নাম তো যোগানন্দ আচার্য। তোমরা ওকে স্বামী বানিয়ে দিচ্ছো দেখছি। যে সব মেয়েরা নিজেদের ভাগ্য কিংবা ভবিষ্যৎ জানবার জন্য ঐ মন্দিরের সামনে লাইন লাগায়, তুমিও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছো, এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে না।

আমি আমার ভাগ্য কিংবা ভবিষ্যৎ জানবার জন্য যাই নি। একবারই তো মাত্র গেছি, সেজন্য তোমার এত রাগ ?

রীণা এবার আলতো হাত বুলিয়ে চোখের জল মুছে ফেললো।

বিশ্বদেব মনে মনে বললো, কাশ্মীর থেকে কোনো যুবক বিয়ের জন্য মেয়ের পর মেয়ে দেখে চলেছে, আর তুমি তার সামনে পাত্রী সেজে এসে বসেছো, এটা ভাবতেও আমার ভালো লাগে না।

মুখে সে বললো, তুমি যে বললে, এই ঘটনা তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কারুকে বলো নি ? যোগানন্দ আচার্যকে নিশ্চয়ই বলেছো।

হ্যাঁ, ওঁকে বলেছি। আমার মা, বাবা এবং দু-একজন আত্মীয়ও জানে। কিন্তু আমার কোনো বন্ধুকে বলি নি কখনো। কারুকে বলতে পারতাম না। তোমাকেই বা কেন হঠাৎ বললাম, তাও জানি না।

শোনো রীণা, এবার তোমায় দুটি খুব জরুরী কথা বলবো। আমি স্পষ্ট কথা বলি, তুমি জানো। আশা করি তুমি রাগ করবে না।

বলো।

আমি তোমাকে ভালবাসি।

বীণার চোখের একটা পল্লবও কাঁপলো না। আগেকার মতন চুম্বক-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে বিশ্বদেবের দিকে।

আমি তোমায় ভালবাসি। এবং আমি তোমায় বিয়ে করতে পারবো না। আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে নেই, অন্তত পাঁচ বছরের মধ্যে।

ও!

আমি ইচ্ছে করলেও অবশ্য তুমিই আমায় বিয়ে করতে পারতে না তা জানি। শুধু ভালোবাসাতে বিয়ে হয় না। আমরা চৌধুরী. জানো তো, চৌধুরী মুসলমান হয়, ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সবই হয়, আমরা খাঁটি শূদ্র।

ভ্যাট! তোমরা তো সেনগুপ্ত!

ওটা আসলে আমার ছদ্মনাম। আমার আসল নাম হারানিধি চৌধুরী। বাবা মা এরকম বিচ্ছিরি নাম রেখেছিলেন বলে আমি ছদ্মনামে লিখি। পদবীও বদলে ফেলেছি।

বিশ্বদেব এখনো ইয়ার্কি করছে কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে বীণা বললো, তোমায় কে বললো যে আমি খুব জাত মানি?

তুমি না মানলেও তোমার বাবা মা মানেন নিশ্চয়ই। যারা কালীমন্দিরে যায়, তারা সবাই জাত মানে। তোমার বাবা মা তোমার বন্ধুর মতন। তুমি তাদের মনে দুঃখ দিতে পারবে না।

তুমি ভেবো না আমি বিয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছি। শুধু তোমাকে একটা কথা জানাতে চাই, আমার দাদা অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করেছেন. আর আমার বৌদি আমার বাবা আর মা দুজনেরই খুব আদরের।

তোমার মুখে রোদ লাগছে। তুমি এদিকে সরে এসো।

ওরা সরে গিয়ে ব্রীজের একেবারে গোড়ায় একটা গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় দাঁড়ালো। সিগারেট ধরাতে গিয়ে বিশ্বদেব নিজেই বুঝতে পারলো সে বেশ উত্তেজিত। যতই সে সাংবাদিকের নির্লিপ্ততা দেখাবার চেষ্টা করুক, ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে তারও বুক কাঁপে।

তোমাকে আরও একটা কথা বলতে চাই, রীণা। পাঁচ বছর বাদে যখন আমার বিয়ে করার ইচ্ছে হবে, অর্থাৎ যদি আদৌ সেরকম কোনো ইচ্ছে মনে জাগে, তখন আমি তোমার কাছে গিয়েই হাত পাতবো। তুমি প্রত্যাখ্যান করতে পারো জেনেও আমি তোমাকেই চাইবো। অবশ্য ততদিনে যদি তোমার বিয়ে হয়ে না যায়।

এতক্ষণ বাদে রীণা হাসলো। কলেজে পড়া দিনগুলোর মতন আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে গিয়ে মুছে গেল তার টিপ। সে বললো, ঐ পাঁচ বছরের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। ঠিক পাঁচ বছরই কেন ? কোনো প্রতিজ্ঞা-ট্রতিজ্ঞা আছে নাকি ?

না। আমি এখন মাইনে পাই সাড়ে আটশো টাকা।

সাড়ে আটশো টাকা মাইনে যারা পায়, তারা বুঝি বিয়ে করে না ?

কেন করবে না ? কিন্তু ঐ টাকা যারা মাইনে পায়, তারা এমন কোনো মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানায় না, যে-মেয়ের দারোয়ানওয়ালা মামাবাড়ি আছে।

সাড়ে আটশো টাকা বুঝি খুব কম ? আমার তো ধারণা অনেক।

আলাদা সংসার পাতবার পক্ষে যথেষ্ট কম। আমি কেটেকুটে হাতে পাই সাতশো টাকা। ঐ টাকায় অবশ্য অনেকে বেশ ভালোই সংসার চালায়, কিন্তু সে-সব পরিবারের বৌরা ট্যাক্সি চেপে থিয়েটার দেখতে যায় না। সে পরিবারের ছেলে-মেয়েরা ইংরিজি স্কুলে পড়ে না। এবং স্ত্রীর যদি দারোয়ানওয়ালা মামাবাড়ি থাকে, তা হলে সেখানে যেতে স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুব লজ্জা এবং অস্বস্তি বোধ করে।

আমার মামাদের বাড়িতে এখন আর দারোয়ান নেই। অবস্থা অনেক পড়ে গেছে। সে যাই হোক, আমি জানতে চাইছি ··

পড়ন্ত অবস্থায় বড়লোকরা বেশী অহঙ্কারী হয়।

বার বার আমার মামাবাড়ির কথা তুলছো কেন ? আমি জানতে চাইছি, ঠিক পাঁচ বছরই কেন ? পাঁচ বছরেই সব বদলে যাবে ?

তার কোনো মানে নেই। পাঁচ বছরের মধ্যে আমি জেনে যাবো, আমার ক্ষমতার দৌড় কতখানি। আমার জীবনধারা এবং জীবিকা বদলাবে কি-না। আমার আলাদা কোনো যোগ্যতা আছে কি-না।

পাঁচ বছরেই তা জানা যাবে?

হ্যাঁ। তখন আমার বয়েস চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ হবে। মানুষের জীবনের কয়েকটা স্তর আছে। যারা দেশের জন্য প্রাণ দেয়, সাধারণত তাদের বয়েস হয় ষোলো থেকে তেইশ, তারপরও বেঁচে থাকলে তারা প্রাণ দেওয়া কিংবা নেওয়া ছেড়ে দল গড়ার দিকে মন দেয়। আর একটু বয়েস হলে তারা দল ভাঙে। আর যারা পড়াশুনো শেষ করে চাকরি ইত্যাদি নিয়ে কেরিয়ার তৈরি করতে চায়—তারাও সাধারণত তেইশ থেকে পঁয়তিরিশ বছরের মধ্যেই জীবনের গতি ঠিক করে নেয়, তারপর আর বিশেষ কিছু বদলায় না। লেখক, শিল্পী, গায়ক, খেলোয়াড়দের কথা তো ছেড়েই দিলাম, তারাও পঁয়তিরিশ বছরের পর হঠাৎ নতুন কিছু ·····

বিশ্বদেব নিজের অজ্ঞাতসারেই সাংবাদিকসুলভ পয়েণ্ট বাই পয়েণ্ট সাজিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। সংলাপ নয়, যেন প্রবন্ধ।

রীণা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। বিয়ের জন্য সত্যিই সে খুব ব্যস্ত নয়। তার বাবা মা চান না সে কোনো চাকরি করে। চাকরি করলে রং কালো হয়ে যায়। পড়াশুনো শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং রীণা ধরেই নিয়েছে এবার তাকে বিয়ে করতে হবে। বিশ্বদেব তাকে বড়লোকের মেয়ে ভাবছে কেন? ফ্ল্যাটের বদলে তাদের নিজস্ব একটা ছোট দোতলা বাড়ি আছে এই যা। মেজদা বিয়ে করলে সে বাড়িতেও জায়গার টানাটানি পড়বে।······যোগানন্দ স্বামী বলেছিলেন, এক বছরের মধ্যে তার বিয়ে হবে, কপালে লেখা আছে। ওঁর কথা মিথ্যে হতে পারে? তা হলে ওঁর ওষুধই মিথ্যে। তার অসুখ সারবে না? অবশ্য এই ক'দিন যোগানন্দ স্বামীর দেওয়া তেল মেখে, এর মধ্যে সে একদিনও মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে নি।

বিশ্বদেব তার বক্তৃতাটি সমাপ্ত করার পর বললো, আশা করি তুমি আমায় ভুল বুঝবে না!

রীণা রহস্যময়ীর মতন ঠোঁটে হাসি এঁকে দু'দিকে মাথা নাড়লো। তারপর বললো, তুমি যতই গম্ভীর গম্ভীর কথা বলো, আসলে কিন্তু তুমি একটি খুব ছেলেমানুষ।

ব্যস, এক কথায় বিশ্বদেবের ব্যক্তিত্ব ধূলিসাৎ।

এবার তা হলে বাড়ি ফিরতে হয়। বিশ্বদেব পা বাড়িয়ে বললো, চলো—।

লেক ক্লাবের পাশ দিয়ে বেঁকে গিয়ে বড় বড় গাছের ছায়া-ঢাকা পথটির ওপর থমকে দাঁড়িয়ে রীণা বললো, আজ তোমাকে বাড়ি থেকে জোর করে টেনে এনে আমার একটা খুব দারুণ লাভ হলো।

আমার ধারণা, আমি তোমায় দুঃখ দিয়েছি।

আমি তোমাকে আমার জীবনের ঐ ঘটনাটা বলবার জন্য এসেছিলাম, কখনো ভাবি নি যে আমার কোনো বন্ধুকে বলতে পারবো। তোমার কাছে বলতে আমার একটুও লজ্জা হলো না, মনটা খুব হাল্‌কা লাগছে। আমি যেন মুক্ত হয়ে গেছি···কিন্তু তার চেয়েও বেশী লাভ হলো আর একটা।

কী?

তুমি যে বললে, তুমি আমায় ভালোবাসো। এমন ভাবে চোখের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় তুমি বললে, আমি যেন একটা অন্য মানুষ হয়ে গেলাম। শুধু ভালোবাসায় বিয়ে হয় না, হয়তো পৃথিবীর কোনো কাজই হয় না, তবু একজন কেউ ভালোবাসে, এটা জানতে পারাই একটা বিশাল পাওয়া। আচ্ছা ···আমি তো তোমাকে ঐ কথাটা বলতে পারি নি। আমি ভালোবাসি কি-না, তা তুমি জিজ্ঞেসও করো নি!

তোমার দরকার নেই।

কেন?

এ বিষয়ে চমৎকার একটা লাইন আছে রবীন্দ্রনাথের—"তুমি যে তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ।"

ঠিক বুঝতে পারলুম না। পরের লাইন কী?

পেছন থেকে একটা গাড়ি আসছে বলে ওরা সরে গেল এবং আবার চলতে শুরু করলো। দু'জনেরই মুখ নিচু। ওদের মুখে এখন এমন একটা আবেগের ছাপ, যাতে মুখের রূপই বদলে যায়। দেড় ঘণ্টা আগে কিংবা দেড় ঘণ্টা পরে রীণা ও বিশ্বদেবের এরকম মুখ ছিল না এবং থাকবে না।

পরের লাইনটা কী বললে না?

পরের লাইনটা এত ভালো নয়। তাতে 'মোর' আর 'শুধি' এই ধরনের শব্দ আছে। এইসব শব্দ আমার পছন্দ নয়। কিন্তু প্রথম লাইনটা সত্যিই খুব সুন্দর। আর তাতেই সব কথা বলা হয়ে যায়। "তুমি তো তুমিই ওগো, সেই তব ঋণ……।"

॥ ৮ ॥

পাঁচু খুন হবার দুদিন পর রাত্রিবেলা এসে ছোটেলাট খুব রাগারাগি করতে লাগলো।

ধান্নুর গলাটা চেপে ধরে হাঁটু দিয়ে কোমরে এক কোঁৎকা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বল শালা, পাঁচুর জান কে হাপিস করেছে?

ধান্নু কাঁপতে কাঁপতে বলে, জানি না, গুরু, সত্যি বলছি কিছু জানি না।

তোরা জানিস না? শালা রাস্তার নেংটি ইঁদুর, তোরা সব জানিস। কার দলে ভিড়েছিল পাঁচু?

মাইরি বলছি জানি না। জানলে তোমায় বলবো না, এ কখনো হয়?

আজ ছোটেলাট আগে থেকেই যথেষ্ট নেশা করে এসেছে। মুখখানা রাগে গনগনে। রাগলে তার মুখের চামড়ার তলা থেকে নিষ্ঠুরতার রেখাগুলো ফুটে ওঠে।

পাঁচুর ওপর ছোটেলাটের রাগ ছিল, সে প্রায়ই কথার খেলাপ করতো। ছিঁচকে বলেই পাঁচু জানতো না যে এ লাইনে কথার

খেলাপ করতে নেই। কাগজপত্রে লেখাপড়ার তো কোনো ব্যাপার নেই, এ লাইনে সব কাজই শুধু মুখের কথায়। অন্যায়ের কারবারীদের প্রধান মূলধন হলো বিশ্বাস।

ছোটেলাট নিজেই শাস্তি দিত পাঁচুকে, প্রাণে মারতো না, একটা হাত মুচড়ে ভেঙে খানিকটা শিক্ষা দিয়ে দিত শুধু। তার আগেই কে খোদার ওপর খোদকারি করলো? কোনো নতুন মাস্তান এসেছে এই মহল্লায়? এক ব্রিডিং বাফেলো যেমন নিজের এলাকায় অন্য ব্রিডিং বাফেলোকে সহ্য করতে পারে না, সেইরকমই নতুন কোনো মাস্তানের চিন্তায় ছোটেলাটের শরীরের সমস্ত রোঁয়া ফুলে উঠলো।

এখন কিছুদিন জায়গাটা গরম হয়ে থাকবে। এই ছুতোয় পুলিস তাকে ধরবার চেষ্টা করবে। পুলিসকে ছোটেলাট গ্রাহ্য করে না। পুলিস তাকে ধরে আর ছেড়ে দেয়। কেস দিতে গেলে প্রমাণ লাগে, প্রমাণ সংগ্রহ করতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অত সময় কোথায় পুলিসের। তাছাড়া রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে কখন ফোন আসবে আর কাকে ছেড়ে দিতে হবে, তা তো ঠিক নেই, তাই পুলিস এদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে না। তার চেয়ে ব্যভিচার কিংবা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী খুন ধরনের মামলা তুলে খবরের কাগজ মারফৎ জনসাধারণকে উত্তেজিত রাখা অনেক সহজ।

মাঝে মাঝে পুলিসেরও হাত নিশপিশ করে, মন এবং পকেট ফাঁকা ফাঁকা লাগে, তখন খানিকটা অ্যাডভেঞ্চার কিংবা প্রতি-যোগিতার লোভে তারা চোর-পুলিস খেলায় মাতে এবং ছোটেলাট-দের মতন দু-চারজনকে ধরে। ওদের কাছ থেকে কিছু খসিয়ে, কয়েক ঘা মেরে হাতের সুখ করে নিয়ে বলে, যাঃ, এখন কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাক।

নতুন মাস্তানরা চট্ করে ধরা পড়ে না। পাঁচুর সূত্রে পুলিস ছোটেলাটকেই খুঁজবে।

আজ ছোটেলাট একা আসে নি। টিপি টিপি বৃষ্টি-পড়া কালো

রাত। কাছেই ছোটেলাটের ট্যাক্সি দাঁড় করানো আছে, এবং কিছু দূরত্বে দুজন বডিগার্ড।

মার খেয়েও ধানুর বুদ্ধি খোলে না। সে বোকার বোকা হদ্দ বোকা। ঘাড়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে বডিগার্ড দুজনের দিকে তাকিয়ে বলে, খোকনা আজ এসেছে, গুরু?

খোকনার নাম উচ্চারণ করাও যে নিষেধ সেকথা মনে রাখে নি বলে ছোটেলাট ধানুকে মাটির ওপর চিৎ করে ফেলে তার গলায় জুতোশুদ্ধু পা তুলে দিয়ে বলে, আজ শালাকো নলি পটাককে দেগা!

খোকনার লাশ এতদিনে গঙ্গা দিয়ে ভাসতে ভাসতে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে গেছে।

আজ আর কুসুমীর সঙ্গে মস্করা করারও মেজাজ নেই ছোটেলাটের। ধানুকে একটা লাথি কষিয়ে বললো, বাঁচতে চাস তো নিতাই ভট্‌চাজকে ডাক!

এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, অন্য হাত কোমরে রেখে সে প্রবল আত্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ালো। কালো প্যান্ট, কালো শার্ট, তার শরীরে একছিটেও মেদ নেই। মাঝে মাঝে বিদ্রূপের হাসি ছাড়া সে কখনো খুশী বা কৌতুকে হাসে না।

নিতাই ভট্‌চাজ আসতেই ছোটেলাট তাকে ঠেলতে ঠেলতে দেয়ালের ধারে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরলো।

তোমার বৌ-বাচ্চার জান আমার হাতে!

সে কি ছোটেলাট, আমি কী করেছি?

কিছু করো নি। যদি বেগড়বাঁই কিছু করো, সেইজন্য আগে থেকে বলে রাখলুম।

ছোটেলাটের উগ্র মেজাজ দেখে নিতাই ভট্‌চাজ চুপ করে রইলো। কথা বললেই বেশী বিপদ।

এরপর ছোটেলাটই অনেকক্ষণ ধরে বলে গেল কাজের কথা।

আজ ছোটেলাটের কালীমন্দিরের সামনে প্রণাম করার কথাও মনে পড়লো না। ঝড়ের পর্বাভাস থাকে. শব্দ শুনে জোয়ার টের

পাওয়া যায়। ছোটেলাটের শরীরেও সেরকম কিছু ঘটছে।

দু'দিন বাদে ভোরবেলা চুঁচড়োর ঘাটে সবে নৌকো ভিড়েছে, এই সময় দুজন পুলিস অফিসার অলসভাবে এগিয়ে এসে বললো, পকেটে হাত দিস না, ছোটে, একেবারে ফুঁড়ে দেবো!

ছোটেলাট ঘাটে নামবার জন্য পা বাড়িয়েছিল, সে এক মুহূর্ত শুধু সময় নিল, তারপরই সামারসল্ট খেয়ে উল্টে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

কিন্তু পালাতে পারলো না ছোটেলাট। তিনখানা নৌকো দিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে কয়েকটা বৈঠার ঘা মারতেই সে মুখ ওপরে তুলে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, আর না!

এত কম প্রতিরোধ করে ছোটেলাট আগে কখনো ধরা দেয়নি। বোধ হয় ধরা পড়ার বীজ তার মধ্যে আগেই রোপিত হয়ে গিয়েছিল।

অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতন ছোটেলাট কখনো পুলিসের সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয় না। পুলিসের হাত ছাড়িয়ে সে পালিয়েছে অনেকবার, কিন্তু কখনোই রুখে দাঁড়িয়ে গুলি চালায় নি, তার বডিগার্ডদেরও এ সম্পর্কে কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে। ছোটেলাট জানে, দু-চারটে এমনি খুন করলেও পুলিস ছেড়ে দেয়, কিন্তু কোনো পুলিস খুন করলে আর কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই। পুলিসবাহিনী ঠিক খুঁজে খুঁজে তাকে বার করে শেষ করবেই। যেসব মাথা-গরম হঠাৎ-মস্তান পুলিস খুন করে, তাদের মৃতদেহ কোনো এক দিন রেল লাইনের ধারে অজ্ঞাত যুবকের লাশ হিসেবে ঠিক পাওয়া যাবেই।

লালবাজারে শৈলেশ গুহরায়ের ঘরে আনা হলো ছোটেলাটকে। ইনি নিজে কখনো মারধোর করেন না, তেমন উল্লেখযোগ্য আসামী হলে তিনি তাদের চেয়ারেও বসতে বলেন, এমন অনুত্তেজিত কণ্ঠস্বর খুব কম লোকেরই দেখা যায়।

শৈলেশ গুহরায় ছোটেলাটকে আগে চোখে দেখেন নি। ছোটেলাট বিখ্যাত ব্যক্তি। বিখ্যাত ব্যক্তিরা সব সময় অপরের মনোযোগ দাবি করেন। তাঁদের অপমান করার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁদের প্রতি অমনোযোগী হওয়া।

দক্ষ অভিনেতার মতন শৈলেশ গুহরায় টাইমিং জিনিসটা খুব ভালো জানেন। ভুরু নাচিয়ে তিনি ছোটেলাটকে টেবিলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসতে বলে খুব নিবিষ্টভাবে পাইপ ধরাতে লাগলেন। এইসব সময়েই আবার পাইপ ঠিকমতন ধরতে চায় না। খোঁচাতে হয়, তারপর যদি না ধোঁয়া বেরোয়, ঠিক সাবলীল ধোঁয়া না আসা পর্যন্ত তা পাইপসেবীর মনঃপূত হয় না।

এইসব প্রক্রিয়ার ফাঁকে ফাঁকে শৈলেশ গুহরায় দেখতে লাগলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিটিকে।

তারপর তৃপ্তির সঙ্গে ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বললেন, ছোটেলাট, অ্যাঁ! তা বড়েলাটটি কে?

ছোটেলাটের বাঁ কানের পেছনে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। বৈঠার ঘায়ে ঐ জায়গাটা কেটে রক্ত বেরিয়েছিল। আর কোথাও তেমন আঘাতের চিহ্ন নেই।

জানি না, স্যার।

তোর বয়েস তো বেশী না, তোরও যখন বয়েস বাড়বে, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হলেই তোকেই, তখন সবাই বড়েলাট বলবে। অবশ্য ততদিন যদি বেঁচে থাকিস।

বাঁচবো না কেন, স্যার? বেঁচে ঠিক থাকবো।

পাইপটি টেবিলে নামিয়ে রেখে শৈলেশ গুহরায় একদৃষ্টিতে প্রায় এক মিনিট তাকিয়ে রইলেন ছোটেলাটের দিকে। রহস্য-কাহিনীতে একেই বলে শ্যেনদৃষ্টি!

শৈলেশ গুহরায় বোঝবার চেষ্টা করলেন, এ লোকটাকে ছাড়াবার জন্য ওপরমহল থেকে টেলিফোন আসবে কিনা। গলার আওয়াজটিতে তো বেশ আত্মবিশ্বাস আছে।

তোর নাম তো লালচাঁদ, তারপর এই ছোটেলাট নাম কে দিল?

জানি না স্যার, সবাই বলে।

আচ্ছা, আগে তাহলে ঠিক করে নেওয়া যাক, তুই কী কী জানিস না। পাঁচু পোদ্দার কে, তা তুই জানিস না নিশ্চয়ই!

জানি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এর মধ্যেই কনফেশন? পাঁচুকে কে মারলো, তাও জানিস নাকি? সেটা বোধ হয় জানিস না, তাই না?

ছোটেলাট তো এজন্য তৈরিই ছিল। যে নতুন মাস্তান পাঁচুকে সাবাড় করেছে, এখান থেকে বেরিয়ে তাকে দেখে নিতে হবে!

স্যার, একদম সাফ সাফ কথা বলবো?

তুই সিগারেট খেতে পারিস?

অ্যাঁ!

বলছি, তোর যদি সিগারেট টানা অভ্যেস থাকে, আর ওরা যদি তোর পকেটে সিগারেট দেশলাই রাখতে দিয়ে থাকে, তাহলে এখানে খেতে পারিস। নেশার জিনিস ঠিক সময়ে না পেলে সাফ কথা বলা যায় না।

না, স্যার, আপনার সামনে স্মোক করবো না!

বেশ। শুনি!

ছোটেলাটের চেয়ারের পেছন দিকে দুজন সাব-ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে আছে। পেছন দিকের দেয়ালেই একটি মহাত্মা গান্ধীর ছবি।

স্যার, আপনাকে সাফ কথা বলছি। শুধুমুদু আপনার টাইম নষ্ট হবে, পাঁচু-মার্ডার-কেসে আমায় ঝোলাতে পারবেন না। বড়জোর একটা পেটি কেস দিতে পারেন। ঐদিন আমি বসিরহাটে একটা দোকানে খানিকটা হল্লাবাজি করেছিলুম।

কী রকম হল্লাবাজি?

হাতে ক্যাশ ছিল না, তাই দোকানের ক্যাশবাক্সটা তুলে নিয়েছিলুম। মোটে দুশো সাতান্ন টাকা।

এত ছোট কাজ করলে তোর মান থাকবে কী করে রে? দলের লোকজন আর কথা শুনবে?

মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়।

হাতে ক্যাশ ছিল না কেন?

দিনকাল খারাপ, স্যার। আপনারা বড্ড কড়াকড়ি করছেন।

শৈলেশ গুহরায় আপন মনে হেসে আবার পাইপে মনোযোগ দিলেন। ভালো তামাক, ধোঁয়ায় সুন্দর গন্ধ।

তাহলে ঠিক দিনক্ষণ হিসেব করে বসিরহাটে হামলাবাজি করেছিলি ?

পাঁচুকে আমি নিজেই খুঁজছিলাম, স্যার !

পাঁচ পেটি বাগদা চিংড়ির ব্যাপারটার জন্য ?

ঠিক বলেছেন, স্যার। আপনারা সবই জানেন। পাঁচুর কেসে আমায় ধরে আনলেন কেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সব কথা কি সহজে বোঝা যায় ? তাহলে পাঁচু-মার্ডার-কেসের সঙ্গে তোর কোন সম্পর্ক নেই, এই তো ?

হ্যাঁ, স্যার।

আর ঐ যে আর একজন ছিল, কী নাম যেন, ইয়ে, মনে পড়ছে না, বল না কী নাম ?

কার কথা বলছেন, স্যার ?

তুই জানিস না কার কথা বলছি ? তপেনবাবু, কী নাম যেন ছেলেটার ?

ছোটেলাটের পেছনে দাঁড়ানো একজন ইন্সপেক্টর বললো, খোকন।

হ্যাঁ, খোকন। ছোটেলাটের ডান হাত। অনেকদিন তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সে কোথায় গেল ?

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ছোটেলাট। চেয়ারের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে বললো, স্যার, খোকন কোথায় আমি জানি না। তবে খোকনকে যদি কেউ সরিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে এই আমি আপনার সামনে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে রাখছি, খোকনকে যে খুন করেছে, তাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না, আমি নিজে তার টুঁটি চেপে মারবো।

ছোটেলাটের এই আস্ফালন মিথ্যে। খোকনাকে যে খুন করেছে, তাকে সে কোনদিনই খুঁজে পাবে না। কারণ খোকনার আততায়ী লুকিয়ে আছে ছোটেলাটেরই শরীরের মধ্যে।

হাসির রোগ ধরেছিল খোকনার। যখন তখন হেসে উঠতো। ডায়মণ্ডহারবার থেকে জিপ গাড়ি নিয়ে জরুরী কাজ শেষ করে ফিরছিল ছোটেলাট, খোকনা আপন মনে হাসছে।

কী রে শালা, এত হাসি কিসের?

গুরু, লোকটার মুখখানা দেখেছিলে? চিম্পুখানা যেই দেখালুম অমনি ওর মুখখানা একেবারে দ। হে—হে—হে—হে—হে!

চোপ!

ছোটেলাটের মত অতি সতর্ক সাবধানী ছেলের পকেট থেকেও একতাড়া নোট কখন পড়ে গেছে রাস্তায়। সেটা বেলঘরিয়ায় খোকনা তখনও ফিক ফিক করে হাসছে।

গুরু তোমার পকেট থেকেও…হে—হে—হে—হে

চোপ বে!

রাত দেড়টায় দমদম লাইনে পুলিস তাড়া করেছে, জীপ চালাচ্ছে ছোটেলাট নিজে। আর খোকনা যেন হেসে গড়াচ্ছে।

তোর কী হলো রে, পাগলা!

পারবে না, গুরু পারবে না! হে—হে—হে—হে—

তুই চুপ করবি কি না।

ছোটেলাটের কপালে ঘাম, আর সেই সময় খোকনা হাসছে। ছোটেলাট এমনিতেই হাসি সহ্য করতে পারে না, তার উপর এই সময়! চেজের সময়টাই সবচেয়ে বিপজ্জনক, ধরা পড়ার আগেই গুলি চালায়।

তুই চুপ করবি, না তোর মুখ ভেঙে দেবো?

পারছি না, গুরু, দারুণ হাসি পাচ্ছে! ওরা গাড্ডায় পড়বে, আমরা ঠিক বেরিয়ে যাবো, হে—হে—হে—হে—

দারুণ জোরে একটা বাঁক ঘুরেই ছোটেলাট একটা লাথি কষিয়েছিল খোকনাকে।

খোকনা তাতেও হেসেছিল।

শেষ পর্যন্ত পুলিসের গাড়িটাকে ঝেড়ে ফেলা হয়েছিল ব্যারাকপুরে এসে। জিপভর্তি মাল। প্রাণের চেয়েও মালের জন্য

বেশী চিন্তা ছিল ছোটেলাটের। ধরা পড়লে মালগুলো তো যেতই।

এরকম অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার পর ছোটেলাটের অভ্যেস পুরো ঘটনাটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একবার কিংবা দুবার বর্ণনা দেওয়া। তাতে কোথায় কোথায় ভুল হয়েছিল সেটা বোঝা যায়। কিন্তু তার কি উপায় আছে, খোকনাটা হেসেই চলেছে বিরক্তিকর ভাবে।

খোকনা!

তোমায় বলেছিলাম না, গুরু, গাড্ডায় পড়বে, হে—হে—হে—হে, কত বাজি বলো, আমি দেখাতে পারি ওরা গাড্ডায় পড়ে চেল্লাচ্ছে, মাইরি বলছি, হে—হে—হে—হে—

এই নিয়ে দশদিন ধরে চলছিল খোকনার হাসির অসুখ। ছোটেলাটের সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

চোখের নিমেষে সে গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা তুলে পর পর তিনবার মেরেছিল খোকনার মাথায়। হাসতে হাসতেই খোকনার শব্দ থেমে গিয়েছিল, ঠোঁটে অসমাপ্ত হাসি, চোখ দুটি স্থির।

জীবিত না মৃত তা বোঝবার জন্য ছোটেলাটকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না। সে আধঘন্টা চেষ্টা করেছিল খোকনাকে জাগাবার। তারপর তার লাশটা গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছিল গঙ্গায়। নিজে গঙ্গার জলে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে তারপর আবার স্টার্ট দিয়েছিল জিপে।

সে সময় তার একটুও দুঃখ বা অনুতাপ হয় নি। তখন তার কানের পাশে যে হাসির শব্দটা বন্ধ হয়েছে, তাতেই সে সন্তুষ্ট।

দেড়দিন বাদে সে প্রবলভাবে অনুভব করেছিল খোকনার অভাব। খোকনা নেই, অথচ সে আছে, এটা কেমন যেন অবাস্তব ব্যাপার, এ যেন ছায়াহীন একজন মানুষ। খোকনার মতন আর কারুকে সে ভালোবাসে নি কখনো।

কিন্তু প্রকৃতির কোনো বিচিত্র নিয়মে সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, সে নিজেই খোকনার হত্যাকারী। সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে খোকনা তার কাছ থেকে ইচ্ছে করে পালিয়ে গেছে কিংবা অন্য

কেউ তাকে খুন করেছে। সেই রাগে সে দাঁত কড়মড় করে। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন সে চোখের সামনে দেখতে পায়, সে নিজে গাড়ির হ্যাণ্ডেল দিয়ে খোকনার মাথায় মারছে। পরের মুহূর্তেই সে নিজের কাছে অস্বীকার করে, যাঃ, এ কখনো হতে পারে? আমি মারবো খোকনাকে? ব্যারাকপুরে ও-ই তো জিপ থেকে নেমে পালালো।

অন্য কারুর মুখে এখন খোকনার নাম সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সে নিজে খুঁজছে খোকনাকে কিংবা তার খুনীকে।

শৈলেশ গুহরায় পাইপের ডগাটি দুবার নাড়লেন। অর্থাৎ ছোটেলাটকে বসে পড়বার জন্য ইঙ্গিত। এর নাম ব্যক্তিত্ব।

তা হলে খোকনের খবরও তুই রাখিস না?

ঐ যে আপনাকে বললাম, স্যার!

তুই কী কী জানিস না, তা তো বোঝা গেল। এবার তুই কী কী জানিস, একটু বল তো?

কিসের কথা জিজ্ঞেস করছেন, স্যার?

টাকাগুলো কোথায় গেল?

টাকা? কিসের টাকা?

টা—কা গু—লো কো-থা-য় গে—ল?

ছোটেলাট চুপ।

লাইন পাল্টালি কেন? বেশ তো মফঃস্বলে রেলের ওয়াগন খালাস করতিস, হঠাৎ ক্যালকাটা পুলিসের এরিয়ায় এসে জুয়েলারি কেসে জড়ালি কেন? আমাদের তুই জ্বালাতন করলে আমরা তোকে জ্বালাবো না?

ছোটেলাট শিউরে উঠলো। এত তাড়াতাড়ি পুলিসের কাছে খবর পৌঁছোয়? লাইন পাল্টাবার ব্যাপারে তার নিজেরও খানিকটা অস্বস্তি ছিল। যে-যার নিজের লাইনের কাজ ভালো জানে। কিন্তু একজন তাকে বুঝিয়েছিল, জুয়েলারি কেস খুব সোজা। গয়নার দোকানের লোকজনের মতন ভীতু লোক আর কোথাও নেই। একবার ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালেই হলো। কারুকে

মারতে হয় না। কাজ সেরে বেরুবার পরও কেউ পেছনে তাড়া করে না। ওদের গয়নাফয়না সব ইনসিওর করা থাকে, তাই সহজেই হাতে তুলে দেয়। সবেমাত্র একটা জুয়েলারি কেসেই অংশ নিয়েছে ছোটেলাট।

তোর হাতে ক্যাশ টাকা নেই, অ্যাঁ? বসিরহাটের এক দোকানে মাত্র শ'আড়াই টাকার জন্য পেটি কেস করেছিস, অ্যাঁ? পরশু রাত্তিরে তুই ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে দু হাজার টাকা অন্তত উড়িয়েছিস আড়াইশো টাকা রোজগার করে দু হাজার টাকা কী ভাবে ওড়ানো যায় আমায় একটু শিখিয়ে দিবি? ম্যাজিক জানিস নাকি রে, অ্যাঁ?

স্যার দু হাজার টাকা তো আমি ওড়াই নি। অন্যরা আমার জন্য খরচা করেছে।

কেন?

এমনিই, আমায় খাতির করে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মেয়েমানুষরাও তোর জন্য পয়সা খরচা করে বুঝি? ভাগ্যবান ব্যক্তি! আমার হিসেব এই যে হাতে অন্তত দু লাখ টাকা না থাকলে কেউ এক রাতে দু হাজার টাকা ওড়ায় না।

দু লাখ? কী বলছেন, স্যার?

পাইপ নিভে গেছে, শৈলেশ গুহরায় আর ধরাবার চেষ্টা করলেন না। দাঁত দিয়ে পাইপের ডগাটা কামড়ে ধরে তিনি চেয়ারের হাতলের ওপর পা তুলে দিলেন। রিভলবিং চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে তিনি ত্যারছা ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ছোটেলাটের দিকে। সেই শ্যেনদৃষ্টি।

তারপর বললেন, এখন যা। আমার ইন্সপেক্টররা দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করবে, তাদের বেশীক্ষণ ভোগান্তি করিস নি। ওদেরও তো দুপুরে খাওয়াদাওয়া করতে হবে? তারপর তুই-ও দুপুরে খানিকটা ঘুমিয়ে নে। রাত্তিরে তোকে নিয়ে আমরা একটু বেরুবো। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে হবে। তোর ডেরা কটা, তিনটে না চারটে? তিনটের তো খোঁজ আমরা জানি। চার নম্বর ডেরোটায় তুই আমাদের একটু নিয়ে যাবি, কেমন

॥ ৯ ॥

দরজাটা ভেজানো ছিল, সামান্য ঠেলে বিশ্বদেব জিজ্ঞেস করলো, আসতে পারি ?

যোগানন্দ তখন সবেমাত্র আসনে বসেছেন, মুখ তুলে বললেন, হ্যাঁ, এসো— ।

বাইরে চটি খুলে রেখে বিশ্বদেব ভেতরে এসে মেঝেতেই বসলো। পরিষ্কার, ঠাণ্ডা মেঝে, দিনে চারবার মোছা হয়। বিশ্বদেব বসলো যোগানন্দর স্পর্শ-দূরত্ব থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

যেন ছোট ছেলে কোনো লোভের জিনিস চাইছে, এইভাবে যোগানন্দ বললেন, দাও দেখি তোমার একটা কড়া সিগরেট !

একটি পিতলের প্রদীপ যোগানন্দর অ্যাসট্রে।

আমি তো জানতামই তুমি আবার আসবে।

এ কথাটা বিশ্বদেবের পছন্দ হলো না। যোগানন্দ আগের দিনও এরকম বলেছিলেন বটে কিন্তু বিশ্বদেব সে-রকম কোনো চুম্বকটানে আসে নি। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো বলেই সে এখানে ঢুকে পড়েছে। যোগানন্দ কি তাকে দীক্ষা দিতে চান ? বুড়ো কি নিজেকে রামকৃষ্ণ ভাবছে নাকি ? বিশ্বদেব অবশ্য জানে, তার বিবেকানন্দ হবার যোগ্যতা নেই।

আপনি ভবিষ্যৎ দেখতে পান ?

কার ভবিষ্যৎ ? পৃথিবীর ?

ভবিষ্যৎ কালের ?

না।

শুনেছি আপনি অলৌকিকভাবে অনেকের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেন, কার কোন অসুখ সারবে কিংবা কেউ কোনো মামলায় জিতবে না হারবে, আর সেসব নাকি মিলেও যায়।

সব সময় মেলে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলে নিশ্চয়ই, নইলে এত লোক আপনাকে মানবে কেন? কিন্তু এগুলো আপনি কী করে বলেন?

কী করে বলি তা জানি না।

জানেন না, নাকি আমায় বলতে চান না?

তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাও নাকি?

নট ইন্টারেস্টেড। আমি সাধারণ ভাবে এই সব তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে কৌতূহলী মাত্র।

শোনো, কোনো মানুষের মুখের দিকে চাইলেই আমি হঠাৎ যেন একটা ছবি দ্যাখতে পাই। তার ভিতরের মানুষটার ছবি। ক্যান দেখি, কী ভাবে দেখি তা তোমারে আমি কইতে পারবো না। এয়ারে তুমি দিব্য ক্ষমতা নাও কইতে পারো। কিন্তু এমন হয়।

সকলের বেলায় দেখতে পান না?

না। কারুর কারুর মনের মধ্যেই বোধ হয় দুই তিনটা মানুষ থাকে। তাগো চেনা বড় শক্ত। তবে সেরকম মানুষ বেশী না।

আপনি সেদিন আমায় ছুঁয়ে দিলেন, আমার সারা শরীর ঝনঝন করে উঠলো সেটা কী ব্যাপার? কোনো লুকোনো তারফার ছিল?

আমি কোনো লুকোচুরির কাজ করি না। মাঝে মাঝে কোনো কোনো দিন মায়ের পূজায় বসলে হঠাৎ যেন আমার শরীরে বিদ্যুৎ ভর করে। আমি নিজেই টের পাই, তখন আমি আর সাধারণ মানুষ থাকি না। তবে রোজ হয় না। আজ নাই, আজ তোমারে ছুঁইলে কিছুই হবে না। এক সপ্তাহ হইয়াই আমার শরীলে বিদ্যুৎ নাই। বড় মনঃকষ্টে আছি।

এসব শুনলেও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

তোমার অবিশ্বাসটা কিন্তু খুব জোরালো না, বিশ্বদেব। সংকটে পড়লে তুমিও বিশ্বাসী হতে পারো। তেমন অবিশ্বাসী আমি মাত্র একজনই দেখিছি। ঘরে এসে বসলেন, আর একটা গন্ধ পেলাম, ঠিক যেমন কোনো মহাপুরুষের আগমন টের পাওয়া যায়। এমন দৃঢ় অবিশ্বাসী এমন নাস্তিকও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছিল।

তিনি কে? কোথায় থাকেন?

অনেকদিন দেখি না। তুমি চা খাবে?

না। আপনাকে আর দুটো-একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাবো। আচ্ছা, বুদ্ধ কিংবা যীশুর জীবনীতে পড়েছি তাঁরা রাস্তায় গরীব, অন্ধ, খোঁড়া লোক দেখলে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতেন। আপনারা এ যুগের মহাপুরুষ, অলৌকিক শক্তি আছে বলে মনে করেন, আপনারা গরীব-দুঃখীদের সাহায্যের জন্য কেন এগিয়ে যান না? কখনো তো রাস্তাঘাটে দেখি না।

তার কারণ যীশু বুদ্ধের আমলের তুলনায় এখন রাস্তাঘাটে হাহার হাজার লক্ষ লক্ষ গরীব-দুঃখী, অন্ধ-আতুর। ওদের উদ্ধার করতে গ্যালে এক আধজন মহাপুরুষে হবে না, শত শত মহাপুরুষ লাগবে!

যোগানন্দ একটু হাসতে লাগলেন। বিশ্বদেব সে হাসিতে যোগ দিল না। সে বললো, তবু যাঁর যতখানি সাধ্য···ধরুন, আপনার এই মন্দিরের সামনের ফুটপাথেই তো কতকগুলো ভিখিরি শুয়ে থাকে, তাদের জন্য আপনি কি কিছু···

ওসব কর্মযোগীদের ব্যাপার। তুমি গীতা পড়েছো? চার রকমের যোগ আছে। আমার সাধনা চতুর্থ যোগের। তাছাড়া, তুমি কর্মফল মানো?

না। কর্মফল মানতে গেলে জন্মান্তরবাদ মানতে হয়। আমার ধারণা জন্মান্তরবাদ একটা বোগাস ব্যাপার!

বাঃ, ভালো কথা। তোমায় তাহলে আর পাপপুণ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। খবরের কাগজে তাহলে অন্য মানুষদের এত নিন্দে করো কেন? এক জীবনের ব্যাপার, যার যা খুশী তাই করবে।

আমার মতে অন্য মানুষের মনে দুঃখ দেওয়া পাপ। অন্যকে শোষণ করে নিজে সুখী হওয়া পাপ। এ ছাড়া নিজের আনন্দের জন্য মানুষ যা খুশী করতে পারে।

তুমি সুখী হও, তুমি আনন্দে থাকো, বিশ্বদেব।

আপনি আমায় আশীর্বাদ করছেন, না অভিশাপ দিচ্ছেন ?

অভিশাপ দেবো কেন ? তুমি আমার কাছে আশীর্বাদও চাও নি, তার প্রয়োজনও নেই তোমার।

আমার ইচ্ছে আছে আপনার একটা জীবনী লেখবার।

আমি মরে গেলে লিখো। অনেকগুলি কাল্পনিক কাহিনী জুড়ে দিও, কিছু মেয়েছেলের রসালো কথা থাকলে লোকে আগ্রহসহকারে পড়বে। তুমিও দুটো পয়সা পাবে।

সেরকম কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি লিখতে চাই আপনার জীবনী, কোনো ভক্তের লেখা নয়। ডিটেইলড অ্যানালিটিকাল···অবশ্য আমাদের দেশে কেউই সত্যি কথাগুলো প্রকাশ করতে চায় না।

আমার জীবনটা হলো কর্পূরের মতন। দুদিন বাদে পৃথিবী থেকে মিলিয়ে যাবো। তবু কোথাও যদি একটু সুগন্ধের স্মৃতি থেকে যায় সেইটুকুই যথেষ্ট। এর আবার জীবনী কি ?

আমি পরে আবার আসবো আপনার কাছে। আজ উঠি।

এসো।

দরজার কাছে গিয়ে বিশ্বদেব আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি যে আপনার নিজের মাকে দেখবার জন্য রোজ রাত্রে জেগে বসে থাকেন, এর মধ্যে একদিনও দেখেছেন ?

এ কথার উত্তর দিলেন না যোগানন্দ, তিনি চক্ষু বুজে নীরব। তাঁর মুখটা ঝুঁকে এলো মুখের কাছে।

পরদিন বেলা এগারোটায় দীপা বৌদির ভৃত্য একটা চিরকুট নিয়ে এলো বিশ্বদেবের কাছে।

বিশ্ব, যদি খুব কাজ না থাকে একবার আসতে পারবে আমাদের এখানে ? ইতি দীপা বৌদি।

সন্ধ্যের ট্রেনে বিশ্বদেবের ধানবাদ যাবার কথা। অনেকদিন বাদে অফিস থেকে সে একটা বাইরে রিপোর্টিং-এর অ্যাসাইনমেণ্ট পেয়েছে। অবশ্য দু'দিনের জন্য। বিশ্বদেব আজ কোল ইণ্ডিয়ার অ্যান্যুয়াল রিপোর্টটা পড়ছিল বসে বসে।

জামা পরে সে নিচে নেমে এলো।

দীপা বৌদির শরীরে বাইরের শাড়ি। তিনি কোথাও বেরুবার জন্য তৈরি। চায়ের কাপে চামচ নাড়ার মিষ্টি টুংটাং শব্দ।

এই নাও তোমার চা। একটা দারুণ সুখবর আছে, বিশ্ব। তুমি আমার সঙ্গে এখন একটু বেরোতে পারবে?

কী ব্যাপার।

রঞ্জনের মেয়ে পছন্দ হয়েছে!

যেন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার লীড নিউজ। দীপা বৌদির একমুখী মন। এক এক সময় এক একটা ব্যাপার নিয়ে মেতে থাকে। এখন তার ঐ ভাইয়ের বিয়েটাই প্রধান ব্যাপার। ওঁর ধারণা, পৃথিবীর সব লোক রঞ্জনের বিয়ে হবে কি হবে না, এটা জানার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

ওর কাকে পছন্দ হয়েছে বলো তো?

একটুও চিন্তা না করে বিশ্বদেব বললো, রীণাকে।

আশ্চর্য, তুমি ঠিক ধরেছো তো! আসলে ব্যাপার কী জানো, রঞ্জন খুব লাজুক। ওর প্রথম দিন দেখেই রীণাকে পছন্দ হয়েছিল। মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারছিল না। অন্য কোনো মেয়ে আর দেখতেই চায় নি। আমরাই জোর করে···এখন রীণাদের বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। আমার সেজমাসী একবার কেদার বদ্রী গিয়েছিলেন, রীণার বাবা-মা'ও গিয়েছিলেন সেবার, সেই থেকে ওঁদের খুব ভাব, পারিবারিক বন্ধুর মতন, আর রীণা মেয়েটাও এত ভালো।

বিশ্বদেব কিছুই মন দিয়ে শুনছে না। সে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ব্রিটিশ কায়দায় চায়ে চুমুক দিচ্ছে, যাতে একটুও শব্দ না হয়।

আমি রীণাদের বাড়িতে একবার যাবো এখন। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

বিশ্বদেব হাসিমুখে তাকিয়ে একটু সময় নিল উত্তর দেবার জন্য। সে যেতেও পারে, না যেতেও পারে। সে গেলে কি রীণা লজ্জা পাবে? কিংবা বিশ্বদেবকেই ভাববে নির্লজ্জ, হৃদয়হীন! নিজের

একেবারে গভীরে ডুব দিয়েও বিশ্বদেব বুঝতে পারলো, সে যে তেমন দুঃখিত বা আহত হয়েছে তা নয়। তার পৌরুষেও আঘাত লাগে নি। সে নির্লিপ্ত ভাবে ব্যাপারটা দেখতে চাইছে।

সেদিন দীপা বৌদি রঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে যাবার সময় বিশ্বদেব এইজন্যই রীণাকে ওপরে তাদের ফ্ল্যাটে যেতে বলে নি। সে রঞ্জনের জন্য সুযোগ খোলা রাখতে চেয়েছিল।

বৌদি, আমার যে একটা কাজ আছে এখন। যেতে পারলে খুব খুশী হতাম, কিন্তু আমায় বিকেলে ট্রেন ধরতেই হবে, তার আগে···

তুমি কোথায় যাচ্ছো ?

এই কাছাকাছিই, অফিসের কাজে।

দীপা এক মুহূর্তের জন্য নিরাশ হলো। পরের মুহূর্তেই আবার জ্বলে উঠে বললো, ওদের বিয়ে হলে বেশ হবে, আমরাও জম্মু-কাশ্মীরে বেড়াতে যাবো। অবশ্য ওরা ওখানে আর বেশীদিন থাকবে না। আর বছরখানেক, তারপর ভুটানে বদলি হবে। শুনেছি রঞ্জন ছ' মাসের জন্য বুডাপেস্টেও যাবে একটা ট্রেনিং-এর জন্য।

বাঃ !

রঞ্জনের এখন একবার জম্মুতে ফিরতেই হবে। দেড় মাস বাদে আর একবার আসবে। ও যাওয়ার আগেই পাকাদেখাটা সেরে রাখতে চাই।

বিশ্বদেব ভাবলো, দীপা বৌদি একবার চিন্তাও করছে না যে রীণা রাজি হবে কি-না। এম-এ পাস মেয়ে হলেও রীণা অরক্ষণীয়া। কোনো সুপাত্র তাকে পছন্দ করলেই সে রাজি হতে বাধ্য।

এমন কি বিশ্বদেব নিজেও এর মধ্যে একটা গোলমাল পাকিয়ে ফেলতে পারে। সে যদি রীণাকে জানায় যে, পাঁচ বছর নয়, সেও আর মাত্র এক বছরের মধ্যেই রীণাকে বিয়ে করতে পারবে। সোভিয়েট দূতাবাসে সে একটা ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদের পার্ট-টাইম কাজ পাচ্ছে, তাতে তার আয় মাসে পাঁচশো টাকা করে বেড়ে যাবে।

রঞ্জনের বাবা মা নেই, তাই দীপা বৌদিরই যেন সব দায়িত্ব। কিন্তু এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তার ঠিক একা একা রীণাদের

বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না। তার স্বামীর কাছ থেকে তো এসব ব্যাপারে কক্ষনো সাহায্য পাওয়া যায় না। ডাক্তারবাবু সদা ব্যস্ত। সবচেয়ে ভালো হতো সেজোমাসীদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে কিন্তু ঠিক এই সময়েই তাঁরা এখানে নেই। প্রত্যেক বছর তাঁদের একবার তীর্থ করতে যাওয়া চাই-ই। দেখা যাক, আর অন্য কোনো মাসীকে টেলিফোনে পাওয়া যায় কি-না।

দীপা বৌদি উঠে দাঁড়াতেই বিশ্বদেব বললো, আমি ধানবাদ থেকে ঘুরে আসি, তারপর সব শুনবো।

তুমি আজ চলে যাচ্ছো, আমি ভেবেছিলাম, আজ বেশ বড় একটা দল নিয়ে নাইট-শোতে সিনেমায় যাবো, রঞ্জন আর রীণাও থাকবে। তুমিও যদি থাকতে—

বিশ্বদেব হেসে বললো, সত্যি, অফিস থেকে ঠিক এই সময়ই একটা কাজ চাপালো।

বিয়ের প্রস্তুতিপর্বে পুরোটাই আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপার থাকে। দীপা বৌদিরা দলবল মিলে সিনেমায় যাবে, খুব ভালো কথা, কিন্তু এসময় বিশ্বদেবের মতন একজন অনাত্মীয় যুবকের উপস্থিত থাকা যে বে-মানান সেটা দীপা বৌদি বুঝতে পারছে না। রঞ্জন এটা পছন্দ করবে কেন? শুধু একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়া নয়, রঞ্জন আর রীণাকে কিছুক্ষণ নিভৃতে থাকার সুযোগ দেওয়া উচিত। রঞ্জন এবং রীণা দু'জনেরই তো কিছু গোপন কথা জানাবার থাকতে পারে!

সন্ধ্যেবেলা ট্রেন ছাড়ার পর বিশ্বদেবের একটা কথা মনে পড়লো।

রীণা ভাববে না তো যে সে ইচ্ছে করেই এ সময় কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে?

রীণা একবার-না-একবার নিশ্চয়ই দেখা করতে চাইবে বিশ্বদেবের সঙ্গে। আধুনিক মেয়েরা অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হলে প্রেমিকের কাছে এসে অনুমতি চায়। ঠিক অনুমতি নয়, মতামত। ওদিকে ততক্ষণে বিয়ের শাড়ি-টাড়ি কেনা চলতে থাকে।

এতক্ষণে বিশ্বদেবের একটু মনখারাপ লাগে। ট্রেনের জানলায় থুতনি রেখে আবছা আলোয় বাইরের চলমান পৃথিবীর দিকে সে

তাকিয়ে থাকে স্থির দৃষ্টিতে। এই সময় রীণার পাশে তার থাকা উচিত ছিল। নিছক প্রেমিক না হয়ে বিশ্বদেব তো রীণার বন্ধুও হতে পারে। বন্ধুর কাছ থেকে মানুষ ভরসা চায়।

কলেজ-জীবন থেকে বিশ্বদেবের আরও তো কয়েকজন বান্ধবী ছিল, তাদেরও প্রায় সকলেরই বিয়ে হয়ে গেছে, বিশ্বদেব সেই সব বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে, উপহার দিয়েছে কমপ্লিমেনটারি পাওয়া বই। কখনো তো এমন মনখারাপ হয় নি। রীণার সঙ্গে মাত্র কয়েক সপ্তাহের পরিচয় .... ।

বিশ্বদেবের মনের একটা অংশ চাইছে বিয়ে না করে আরও কয়েক বছর স্বাধীন ভাবে থাকতে। বিয়ে না করলে চাকরি ছাড়ার ঝুঁকি এমন কি প্রাণের ঝুঁকি পর্যন্ত নেওয়া যায়। নিজের ক্ষমতা যাচাই করার জন্য বিশ্বদেবের এখনো সেরকম দু'একটি ঝুঁকি নেবার ইচ্ছে আছে। তার মনের অপর অংশ চাইছে রীণাকে না হারাতে। রীণার সাহচর্যে সে অনেকক্ষণ প্রাণখুলে কথা বলতে পারে। এর আগে আর কোনো পুরুষ বা নারীর সঙ্গে সে নিরালায় এত সহজ হতে পারে নি।

বিশ্বদেব যদি রাজি হয়, তাহলে কি রীণা রঞ্জনের বদলে তাকেই বেছে নেবে ?

বিশ্বদেব পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে তিনবার টস্ করলো। তিনবারই না হলো !

তবু বিশ্বদেব ভাবলো, সে চাইলেই রীণা তার।

বাড়িতে কিংবা অফিসে খোঁজ করলেই রীণা জানতে পারবে যে বিশ্বদেব সত্যিই অফিসের কাজে বাইরে গেছে। পালায় নি। আগে থেকেই তার যাওয়া ঠিক ছিল। এরকম যে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেকথা রীণাকে বিশ্বদেব জানায় নি অবশ্য। কিন্তু খবরের কাগজে এসব ব্যাপার হঠাৎই ঠিক হয়।

রীণা এই দু'দিন অপেক্ষা করতে পারবে না তার জন্য ? অবশ্য রঞ্জনেরও সময় নেই, সে আর মাত্র চার দিন থাকবে কলকাতায়। বিশ্বদেবের জন্য দু দিন অপেক্ষা করলে রঞ্জনের জন্যও সময় বাকি

থাকে আর দু দিন। এ যেন রঞ্জন ও বিশ্বদেব দু'জনেরই গণতান্ত্রিক সমান অধিকার।

রীণা যদি বিশ্বদেবের জন্য এই দু'দিনও অপেক্ষা করতে না পারে, তা হলে তার সঙ্গে সারাজীবনের বোঝাবুঝি হবে কী করে? যেন একটা জুয়ায় বাজি ধরেছে, এইরকম মন নিয়ে বিশ্বদেব এবার ট্রেনের জানলা দিয়ে একটা হাসি পাঠিয়ে দিল।

। ১০ ।

নিতাই ভট্চাজ অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বললো, গুরুদেব, একজন খুব কাকুতি-মিনতি করছে, আপনি—আপনি যদি তার সঙ্গে একটু বাইরে গিয়ে দেখা করেন।

যোগানন্দ আচার্য প্রথমে বিস্মিত হলেন, তারপর তাঁর চোখে রাগ ফুটে উঠলো। এমন অনুরোধ নিতাই তাকে করে কোন্ সাহসে? কোনোদিন তিনি কোনো ভক্তের বাড়ি যান না। কারুর সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করেন না।

কোন লাট-বাদশা এসেছে যে আমায় বাইরে যেতে হবে?

আজ্ঞে তিনি একজন মুসলমান।

মুসলমান তো কী। আমি আসতে বারণ করেছি?

আজ্ঞে, এই কালীমন্দিরের মধ্যে।

কালীমন্দিরকে যদি সে ভয় পায়, তাহলে আমার সাথে তার কী দরকার? আসতে হয় আসুক, নাহলে চলে যাক্।

সে যা বলতে বললো আমি তাই বললাম।

তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা নিয়েছিস?

আজ্ঞে না। এক পয়সাও না। আপনার পা ছুঁয়ে কিরে করতে পারি।

রাত প্রায় সাড়েদশটা, দর্শনার্থীরা একটু আগে বিদায় নিয়েছে। এখন থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত যোগানন্দ বইটই পড়েন।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চল্।

গরম পড়েছে বলে খালি গা, গলার দু'পাশ দিয়ে একটা চাদর ফেলা। যোগানন্দ খড়মটা পরে নিয়ে ঠক ঠক শব্দ করতে করতে বাইরে এলেন। এইরকম সময় রাস্তায় বেরুতে কেউ তাঁকে দেখে নি কখনো।

মাড়োয়ারীদের বাড়ির সামনে একটি মাঝারি আকারের বাগান। সেই বাগানের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মীর মশারফ চৌধুরী সাহেব। সাদা পোশাকে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গী।

মীর সাহেব দু' হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, আপনার কাছে আমি অপরাধী, তাই ক্ষমা চাইতে এলাম। আপনি যে কষ্ট করে বাইরে এসেছেন, এজন্য আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে রইলাম।

যোগানন্দ কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন এই অচেনা লোকটির মুখের দিকে। কয়েকদিন ধরে তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ নেই, তাই তিনি লোকচরিত্র বিচার করতে পারছেন না ঠিক।

আপনি?

আজ্ঞে অধীনের নাম···

এবার যোগানন্দর মনে পড়লো যে তিনি কিছুদিন আগেই শুনেছেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক বস্তির লোকজনদের নানারকম দরখাস্ত লিখে দেয় এবং ছোট ছেলেমেয়েদের বিস্কুট খাওয়ায়। এই তাহলে সেই লোক?

যোগানন্দ প্রসন্নমুখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ভেতরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান নি কেন? আপনি গেলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যাবে? না মন্দিরের ভেতরে পা দিলে আপনি নিজে অপবিত্র হয়ে যাবেন বা আপনার ধর্মে পতিত হবেন?

অতটা ভেবে দেখি নি। যে-কোনো কারণেই হোক, আমার যাওয়াটা ঠিক নয় ভেবেছিলাম।

ইচ্ছে করলে আপনি মন্দিরের মধ্যে আমার ঘরে বসে কথা বলতে পারেন। আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই।

সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয়, আমার না যাওয়াই ভালো। আপনি মহাপুরুষ আপনি অনেক কিছু পারেন, আমরা সাধারণ

লোক, আমরা সহজে নিয়ম ভাঙতে পারি না। এখানেই দু-একটা কথা যদি বলা যায়—।

একজন পথচারী এই সময় যোগানন্দকে দেখে ঢিপ করে প্রণাম করলো।

যোগানন্দ হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, এখন যাও।

লোকটি চলে যাবার পর যোগানন্দ মীর সাহেবকে বললেন, দেখলেন তো, পথে দাঁড়িয়ে কথা বলার এই অসুবিধে। আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে।

কাছেই একটা ছোট পার্ক, তার মধ্যে দুটি তিনটি মাত্র বসবার জায়গা এখনো অক্ষত আছে। তার একটাতে বসলেন যোগানন্দ, মীর সাহেব সম্মান দেখিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দূরে।

যোগানন্দ পাশে চাপড় মেরে বললেন, এখানে এসে বসুন। আপনার কথা আমি শুনেছি।

আমি অতি সামান্য লোক—।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করায় মীর সাহেব বসলেন বেঞ্চিতে।

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলুন, আপনি আমার কাছে কী অপরাধ করেছেন ?

আমি আপনার কথার বিপরীত কার্য করেছি একটা, সেই থেকে বড় মর্মপীড়া বোধ করি।

বুঝলাম না ! খুলে বলুন।

আপনার মন্দিরের পেছনেই যে বস্তি, সেখানকার একটি মেয়ে, তার নাম কুসুমী, হয়তো আপনার মনে নেই।

হ্যাঁ, মনে আছে।

আপনি তার বিবাহ দিতে নিষেধ করেছিলেন। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ, কিন্তু আমিই ভুল করেছি। মেয়েটির অবস্থা দেখে আমি ওর মাকে বিপরীত পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমি খোঁজখবর নিয়ে ভেবেছিলাম বুঝি ভালো পাত্র। সব বিফলে গেল, আপনার কথাই সত্য, মেয়েটির সর্বনাশ হয়ে গেল।

যোগানন্দ চুপ করে রইলেন।

মীর সাহেব আবার বললেন, মেয়েটিকে দেখি আর আমার বুক ফেটে যায়। মনে হয় যেন আমিই দায়ী। কেন এমন করলাম। কেন আপনার কথা শুনি নি!

দায়ী ওর নিয়তি।

তা হতে পারে। কিন্তু আমি তো নিমিত্তের ভাগী। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আমি আপনার দোষ ধরি না. তাই ক্ষমার কথাও ওঠে না।

আপনার কাছে আমার আর একটা অনুরোধ। আপনার এত ক্ষমতা। মানুষের রোগ, শোক, তাপ আপনি দূর করে দেন, ঐ মেয়েটার জন্য কিছু করতে পারেন না? আপনি দয়া করলেই ও সেরে উঠবে।

ওকে সারাবার ক্ষমতা আমার নেই।

কেন?

সে কথার উত্তর আমি দেই না। ওর জন্য আমি মায়ের কাছে বসেছিলাম। মায়ের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পাই নাই। তার অর্থ ওর কর্মফল ভোগ শেষ হয় নাই, আপনি আমি কী করতে পারি?

আপনি ওর সম্বন্ধে অনেকগুলি না বলেছেন। একটা কিছু আশার কথা বলুন, অতটুকু মেয়ে, জীবনে কত সাধ ছিল। ও ওরকম পথের ওপরেই মরবে?

জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা তো আমি নই মিঞা ভাই!

মীর সাহেব একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর শুকনো, রোগা মুখখানি যেন বিষন্নতায় আরও ছোট হয়ে গেছে।

আপনি কি শুধু ঐ মেয়েটির কথা জিজ্ঞেস করতেই আমার কাছে এসেছিলেন? আর কোনো কথা নেই?

না, আর তো কিছু নেই!

প্রায় সবাই নিজের সম্পর্কে কিছু জানবার জন্য আসে।

তা হলে ধরে নেন, আমিও সেজন্য এসেছি। ঐ মেয়েটির জন্য আমার মনের মধ্যে যে অপরাধের জ্বালা, তা কী করে জুড়োবে, সেই

কথা জানতে এসেছি। আপনার মা ইচ্ছে করলেই ও মেয়েটির মঙ্গল করে দিতে পারেন। আমার মায়ের সেরকম ইচ্ছা তো আমি টের পাই নাই। আমার মাইধ্যম ছাড়াও তিনি ওর মঙ্গল করতে পারেন।

আর একটা উপায় আছে, যদি আপনি সাহায্য করেন—

আমি ? কী সাহায্য ?

আমি মুসলমান, আমার পক্ষে এখানে অনেক কিছু করার অসুবিধা আছে। কিন্তু কুসুমীকে আমি আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। আমি তার সেবা করবো। লোকে যদি কিছু বলে, আমি ওকে নিকেও করতে পারি। আমার ঘরে বউ নেই, বাল-বাচ্চা নেই।

যোগানন্দ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন মীর সাহেবের মুখের দিকে।

আপনি সাহায্য করলে ওকে নিয়ে যাই। রাস্তার ভিখারির কি কোনো জাত আছে ? তবু ও যে-কদিন বাঁচবে, একটা ঘর-সংসার পাবে, নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে ইচ্ছেমতন খাবে।

কথাটি বড় ভালোই বলেছেন, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য যে সত্যিই ভালো, তা কী করে বুঝা যাবে ;

এ কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন।

অনেক বদলোক মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যবসা করে। কানা-খোঁড়াদের দিয়ে ভিক্ষে করিয়ে সেই রোজগার নিজেরা নেয়, এমনও শুনেছি।

আপনি ঠিকই শুনেছেন। বদলোকেরা মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যবসা করে। এ শহরে এমন অনেক চলছে। কিন্তু যদি মনে না করেন, তা হলে জিজ্ঞেস করতে পারি কি, এমন তো অনেক চলছে, আপনি কোথাও বাধা দিয়েছেন কি ? কুসুমীর বেলাতেও যদি তেমন হয়, তাহলে কি আপনি বাধা দেবেন ?

শুনুন মিঞা ভাই। পৃথিবীতে খুন-জখম অনেক চলছে আমরা জানি, তবু তা ঠেকাবার জন্য কিছু করি না। কিন্তু চোখের সামনে যদি দেখি একজন মানুষ আর একজনকে ছোড়া দিয়ে মারতে চলেছে, তখন কি বাধা দেবার চেষ্টা করবো না ?

মানুষ কি মানুষকে শুধু ছুরি-ছোরা দিয়ে মারে? অবজ্ঞা দিয়ে, অবহেলা দিয়ে, ঘৃণা দিয়ে মারে না?

তা বটে!

এমনভাবে ঐ মেয়েটিকে অনেকদিন ধরেই সবাই মারছে না?

মীর সাহেব কথা বলতে বলতেই হঠাৎলাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কণ্ঠস্বর বদলে বললেন, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনার দেরি করিয়ে দিচ্ছি। আপনি আমার উদ্দেশ্যের প্রমাণ চান?

কী প্রমাণ?

আসুন আমার সঙ্গে।

মীর সাহেব বেশ দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলেন মন্দিরের দিকে। মন্দিরের চত্বরে এসেও থামলেন না, ঢুকে পড়লেন ছাউনির মধ্যে। তাঁর চোখ দুটি যেন হীরের কুচির মতন জ্বলছে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে ঘা-ওয়ালা পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে কুস্‌মী। অন্য ভিখারিরা জেগে আছে কয়েকজন, তারা যোগানন্দকে দেখে সচকিত।

মীর সাহেব বললেন, দেখুন, রাতের পর রাত এইভাবে ঘুমিয়ে থাকে, এই কি মানুষের জীবন? যদি এজন্য আমি দায়ী হই···

যোগানন্দ বললেন, কেউ অন্য মানুষের জন্য দায়ী হয় না।

কিন্তু একজন অন্য মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারে।

মীর সাহেব ঝপ করে বসে পড়ে কুস্‌মীর সেই পুঁজ-রক্ত-মাখা ক্ষত জিভ দিয়ে চাটতে লাগলেন।

ঘুম ভেঙে কুস্‌মী এমন অবাক হয়ে গেল যে সে একটাও কথা বলতে পারলো না। পা-টা সরিয়ে নিতেও পারলো না, মীর সাহেব শক্ত করে চেপে ধরে চেটেই চলেছেন।

যোগানন্দ জোর করে মীর সাহেবকে তুলে ধরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর অভিভূত স্বরে বললেন, আমি কোনো মানুষকে প্রণাম করি না, নইলে আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম।

মীর সাহেবের চোখে জল, তিনি আস্তে আস্তে বললেন, না না, ছি ছি, আপনার তুলনায় আমি কিছু না।

যারা ঘৃণা দমন করতে পারে, তারা অসাধারণ মানুষ বৈকি। আপনি আমার নমস্য।

আমায় লজ্জা দেবেন না, আচার্য মশাই। কুস্‌মীকে আমি এবার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?

নিশ্চয়ই, যদি ও রাজি থাকে .....

তক্ষুনি একটা রিকশা ডেকে পোঁটলা-পুঁটলি সমেত কুস্‌মীকে তুলে দেওয়া হলো। কুস্‌মী সামান্য আপত্তি করতে যাচ্ছিল, যোগানন্দ নিজে তার হাত ধরে রিকশার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি সুখী হও, মা।

রিকশা পথের বাঁকে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন যোগানন্দ। তাঁর দৃষ্টি স্থির। তিনি ভিতরে ভিতরে খুব দুর্বল বোধ করছেন। মীরসাহেব নামে মানুষটিকে তিনি একটুও বুঝতে পারলেন না। তাঁর পর পর দুটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

সেই রাতেই ঘণ্টা দু-এক বাদে দুখানা পুলিসের গাড়ি থামলো মন্দিরের সামনে। একটা গাড়িতে হাতকড়া বাঁধা ছোটেলাট।

শৈলেশ গুহরায় আগে থেকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, অন্যান্য পুলিসদের জুতোর ফিতে খোলা। গাড়ি থামতেই সবাই খালি পায়ে লাফিয়ে পড়লো। মন্দিরের মধ্যে ঢোকার জন্য জুতো খুলতেও যেন দেরি না হয়।

নানারকম শব্দ পেয়ে যোগানন্দ তাঁর সাধনার আসন থেকে ডাকতে লাগলেন, নিতাই, নিতাই!

নিতাই ভট্‌চাজের জামার কলারটা শক্ত করে চেপে টানতে টানতে দরজার কাছে এনে শৈলেশ গুহরায় বললেন, একে আমরা ধরেছি, লালবাজারে নিয়ে যাবো।

পুলিস দেখে যোগানন্দ খুব একটা চমকে উঠলেন না।

কণ্ঠস্বর শান্ত রেখেই তিনি ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, মন্দির ভাঙতে এসেছেন? ভাঙুন।

শৈলেশ গুহরায় বললেন, না। আমরা সেজন্য আসিনি। মন্দির ভাঙা আমাদের কাজ নয়, সে যাদের কাজ তারা বুঝবে।

তাহলে হঠাৎ এই সময় আগমন?

আপনার সাধনায় ব্যাঘাত করলাম বলে দুঃখিত। আমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, আমরা ভেতরটা একটু সার্চ করবো।

আপনারা দিনের বেলা আসতে পারেন না? এমন নিষুতি রাতে!

দিনের বেলা আপনার ভক্তটক্তরা থাকে, তাদের সামনে আর—

সেইজন্যই তো দিনের বেলা আসতে বলিছি। যা কিছু করবেন, সবার চোখের সামনে। এমন অন্ধকারে চুপি চুপি আপনারা এলে রটে যাবে যে এখানে বুঝি কোনো অসংগত, অন্যায় কাজ হচ্ছে।

আপনি এই যে লোকটাকে রেখেছেন, ও বামুন নয়। ওর নাম বলে নিতাই ভট্‌চাজ, কিন্তু আসলে ওর নাম নিতাই দাস। বামুন না হয়েও ও পৈতে ঝুলিয়েছে আর এতদিন আপনার মন্দিরের কাজ করেছে।

নিতাইয়ের দিকে একপলক তাকিয়ে যোগানন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, ও আমার কাছে বামুন হিসেবেই পরিচয় দিয়েছে বটে, কিন্তু বামুন না হলে যে মন্দিরের কাজ করতে পারবে না, এমন কোনো সংস্কার আমার নেই।

ওর বারাসতে বাড়ি, সেখানে বউ-ছেলেমেয়ে আছে। সে বাড়ি সার্চ করে অনেকগুলো চোরাই গয়না, সোনার বাট, একটা বড় প্যাকিং-বক্স-ভর্তি গন্ধক এইসব পাওয়া গেছে। হয় ও নিজে স্মাগলার, ওয়াগন-ব্রেকারদের সঙ্গে জড়িত, অথবা তাদের হয়ে ও কেনা-বেচার কাজ করে।

যোগানন্দ আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন।

তারপর মুখ তুলে কাতর গলায় বললেন, মানুষ এত লোভী হয় কেন বলুন তো? নিতাইয়ের তো এখানে খাওয়া পরার কোনো অভাব ছিল না। আমি শুনেছি ও ভক্তদের কাছ থেকে দু-চার টাকা করে নেয়। যদি চুরি ডাকাতির দিকেই ওর ঝোঁক থাকবে,

তাহলে মন্দিরে এসে কাজ নেবার দরকার কী? মায়ের ঘরটা তো ও ধুয়ে মুছে রাখতো বেশ মন দিয়ে।

আজ্ঞে, মন্দিরে চোরাই জিনিস লুকিয়ে রাখার সুবিধে, আমরা পুলিসরা ধর্মস্থানে চট করে ঢুকি না। ডেফিনিট প্রমাণ না থাকলে।

আপনাদের কথা না হয় বুঝলাম। কিন্তু পাপের ভয় নেই! মা ক্রুদ্ধ হলে যে সর্বস্ব ছারখারে যাবে।

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমাদের পক্ষে শক্ত। আমরা পুলিস, আমরা পাপ-পুণ্যের বিচার করি না। শুধু আইন রক্ষা করাই আমাদের কাজ।

আসুন, আমার ঘর সার্চ করুন।

আমরা শুধু নিতাইয়ের শোওয়ার জায়গা—

না, সব জায়গা দেখুন। আমার ঘরও দেখুন। ঐ যে আমার বেতের বাক্স।

ইতিমধ্যেই দুজন ইন্‌স্‌পেক্টর নিতাইয়ের ঘর তল্লাশ করে ফেলেছে। মোট সাড়ে চার হাজার টাকা পাওয়া গেছে সেখান থেকে। তার মধ্যে তিন হাজার একেবারে নতুন কড়কড়ে পর পর নম্বরী নোট, সে টাকা নিতাইয়ের হতেই পারে না। এ ছাড়া দুটি সোনার গয়না।

শৈলেশ গুহরায় সেই গয়না দুটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটি কি মা-কালীর গয়না?

যোগানন্দ বললেন, না। আমি মায়ের গায়ে কখনো সোনার গয়না পরাইনি। ভক্তরা কেউ কেউ চাইলেও আমি রাজি হইনি। মা আমার নির্বসনা, নরমুণ্ড মালা যাঁর গয়না, তাঁর আবার সোনার গয়নার প্রয়োজন কী?

এগুলোও চোরাই তা হলে!

মন্দিরের অন্যান্য জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর তেমন কিছু পাওয়া গেল না। শৈলেশ গুহরায় আরও অনেক কিছু আশা করেছিলেন। এমনও হতে পারে, ছোটেলাটের ধরা পড়ার খবর পেয়ে নিতাই অন্যান্য মাল আগেই পাচার করে ফেলেছে!

যোগানন্দ জিজ্ঞেস করলেন, আমাকেও লালবাজার যেতে হবে?

শৈলেশ গুহরায় ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না। আমরা পাকা খবর নিয়ে এসেছি, আপনাকে ধোঁকা দিয়ে নিতাই অনেকদিন ধরে এখানে এসব কারবার চালাচ্ছে।

কতদিন?

তা প্রায় বছর দেড়েক।

আশ্চর্য, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি!

সেই কথা ভেবে তো আমরাও আশ্চর্য হই। আপনারা দিব্যদ্রষ্টা, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা কত লোকের কাছে শুনেছি, অথচ এমন একটা বদমায়েসকে এত দিনেও চিনতে পারেননি?

যে-সব মানুষের ভেতরে দুটো তিনটে করে মানুষ থাকে, তাদের চেনা বড় শক্ত। ওর এত ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে ওকে বিশ্বাস করেছিলুম!

এতক্ষণ বাদে নিতাই বললো, গুরুদেব আমার দোষ নেই। ঐ ছোটেলাট নামে একজন আছে, সে আমার বউ-ছেলেমেয়ের ওপর অত্যাচার করার ভয় দেখিয়ে—

শৈলেশ গুহরায় তার কাঁধে একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, চুপ! নাম ভাঁড়িয়েছিলি কার ভয়ে, অ্যাঁ? চল্ না আরও কত পুরোনো রেকর্ড আছে তোর, সব আমরা বার করছি!

নিতাইকে অন্য একজন পুলিসের হাতে সমর্পণ করে শৈলেশ গুহরায় কালীমূর্তির সামনে গিয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

তারপর যোগানন্দর কাছে বিদায় নেবার জন্য এসে বললেন, আমাদের ব্যক্তিগত অপরাধ নেবেন না, কর্তব্যের খাতিরেই আমাদের আসতে হয়।

যোগানন্দ চুপ করে বসে রইলেন।

এত রাতেও কিছু ভিখিরি আর ভবঘুরের ভিড় জমে গেছে বাইরে।

নিতাই ছাড়া যে আর একজন মন্দিরে থাকতো, সে ক'দিন আগে হালিশহরে তার কোনো এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে

গেছে। মন্দিরে এখন যোগানন্দ ছাড়া আর কেউ নেই।

মন্দিরের দরজা খোলাই রইলো, যোগানন্দ উঠে গিয়ে নিজে বন্ধ করে আসবার কথা একবারও ভাবলেন না। মানুষজন হয়তো কেউ ঢুকবে না। কিন্তু কুকুর ঢুকে আসতে পারে।

অনেকক্ষণ নিঝুম, বিমর্ষ হয়ে বসে রইলেন যোগানন্দ। আজ আর মন আর চক্ষুকে এক করার কোনো আশা নেই।

নিতাইয়ের জন্য যে তিনি খুব বেশী একটা আঘাত পেয়েছেন তা নয়। মানুষ চেনা বড় শক্ত। জীবনে অনেক কিছু এরকম ঠেকে শিখতে হয়, শেখার শেষ নেই। কিন্তু যোগানন্দর দুঃখ লাগছে এই জন্য যে, নিতাইয়ের ব্যাপারে মা তাঁকে কোনো নির্দেশ দিলেন না কেন? কোনো কোনো লোকের দিকে তাকালেই তিনি বুঝতে পারেন, সে লোকটা খল। কারুকে দেখলেই বোঝা যায়, সে অতি-মাত্রায় বিষয়ী। আবার কেউবা উদাসীন স্বভাবের। কারুর চোখে চোখ রাখলেই তিনি জেনে যান যে তার আয়ু বেশী দিন নেই। এই যে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা, এ তো মায়েরই কৃপায়।

বেশ কয়েকদিন ধরে যোগানন্দ তাঁর শরীরে অনুভব করছেন না বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। শরীরে সেই বিদ্যুৎ যখন থাকে, তখন তিনি নিজেকে অন্য সব মানুষের চেয়ে আলাদা মনে করেন, তাঁর মনের জোর অনেক বেড়ে যায়। তাঁর নিজের প্রতিটি কথাই মনে হয় ধ্রুব সত্য। সেই বিদ্যুৎ কোথায় গেল?

আর একটা ব্যাপারেও যোগানন্দ ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছেন। তাঁর সাজ্যাতিক দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে। তিনি তার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রায়ই শেষরাত্রে তিনি এক নারীমূর্তি দেখছেন। নিজের মাকে দেখতে চেয়েছিলেন, দেখতে পাচ্ছেন অন্য একজনকে। আরপুলি লেনের চক্রবর্তীদের মেয়ে কল্যাণী। আঠেরো-উনিশ বছর বয়েস। কতকাল আগের কথা, অন্তত তিরিশ বছর আগে তিনি দেখেছিলেন ঐ মেয়েটিকে। সে কেন এখন আসছে চোখের সামনে? প্রত্যেকবার একই ভঙ্গিতে নয়। কোনোদিন তিনি দেখছেন, একতলার কলঘরের সামনে বসে কাপড় কাচছে কল্যাণী।

ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকায়। কোনোদিন বা উঠে যাচ্ছে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে, পরনে সামান্য একটা ডুরেশাড়ি।

যোগানন্দ সারারাত জেগে সাধনা করছেন কি এই এ অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য দেখবার জন্য?

যোগানন্দর শরীরে এখন আর কামনা বাসনা নেই। নারীর প্রতি আকর্ষণ নেই। তবে কেন এই যুবতীর ছবি আসে চোখের সামনে? যৌবনের কোনো না-মেটা বাসনা ফিরে আসছে এতদিন পর? এমন হয়?

একসময় যোগানন্দ বড় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। নিতাইয়ের কথা তিনি মন থেকে মুছে ফেলতে চাইলেই পারবেন, কিন্তু চক্ষু বুজলেই ঐ আরপুলি লেনের কল্যাণীর ছবি কেন ভাসে? সেই কল্যাণী এতদিন আর যুবতী নেই, নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। ছেলেমেয়ে হয়েছে। এমন কি সে বেঁচে নাও থাকতে পারে। যোগানন্দর এমনও ইচ্ছে হয়, একদিন আরপুলি লেনে গিয়ে ওর খবর নিয়ে আসবেন।

চায়ের সময় বলে যোগানন্দ তৃষ্ণা বোধ করছেন কিন্তু চা খাবেন না। নিজে চা তৈরি করে নিতে পারেন। কিন্তু তা হলেই নিতাইয়ের কথা মনে পড়বে।

তিনি আসন ছেড়ে উঠে কালীমূর্তির সামনে গিয়ে বসলেন।

পঞ্চপ্রদীপের সলতেগুলো জ্বেলে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, মা মা, এমন কেন হলো? এমন কেন হলো? আমি অতি সাধারণ হয়ে যাচ্ছি!

সে রাত কেটে গেল অমনি ভাবেই।

পরের দিন তিনি শরীর অসুস্থতার জন্য ভক্তদের সঙ্গে দেখা করলেন না। শরীরে শুধু ব্যথা-ব্যথা ভাব, কিন্তু মন বড় উতলা, চঞ্চল।

আজকের রাতেও যোগানন্দ বেশীক্ষণ সাধনায় বসতে পারলেন না। একবার চোখ বুজে কল্যাণীকে দেখতে পেয়েই তিনি রাগত ভাবে বলে উঠলেন, তুমি কেন আসো? তুমি কি আমার মা?

কালীমূর্তির সামনে বসলে এ দৃশ্য চোখে ভাসে না বলে যোগানন্দ আজও উঠে গেলেন সেখানে। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালালেন।

চোখ বুজে অনেকক্ষণ আন্তরিকভাবে মাকে ডাকার পর তিনি শুনতে পেলেন কিচ্ কিচ্ শব্দ। কালীমূর্তির পেছন থেকে।

রাস্তার ওপর মন্দির, এখানে রাস্তার ইঁদুর তো আসবেই। এরাও কৃষ্ণের জীব। যোগানন্দ রাগ করেন না। সন্দেশ বাতাসার গুঁড়ো খেতে আসে।

দুটি ইঁদুর ঝগড়া করছে বোঝা যায়। তারপর একটি ইঁদুর কালী-মূর্তির পাশ দিয়ে সামনে চলে এলো। তার মুখে একটা বড় কাগজ।

পঞ্চপ্রদীপের আলোতেও যোগানন্দ বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন, সেই কাগজটি একটি একশো টাকার নোট।

তিনি একটু নড়াচড়া করতেই ইঁদুরটি ভেতরে ঢুকে গেল আবার।

পঞ্চপ্রদীপটি হাতে নিয়ে যোগানন্দ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। মূর্তির পেছন দিয়ে আলো ফেলে দেখলেন সেখানে পড়ে আছে অনেকগুলি ওরকম নোট, তার ওপর লাফালাফি করছে দুটো ধেড়ে ইঁদুর।

মূর্তিটির পেছনদিকটা ফাঁকা। একটি খয়েরি রঙের কাগজ সাঁটা থাকে পেছনে। সেটা ছিঁড়ে গেছে, আর আর সেই ছেঁড়া জায়গা থেকে ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে টাকা। অনেক টাকা।

যোগানন্দ সেই কাগজের মধ্যে হাত ঢোকালেন। থরে থরে আরও টাকা সাজানো তো রয়েছেই। সেগুলো মাটিতে ফেলবার পর যোগানন্দর হাত লাগলো একটা ছোট কাঠের বাক্সে। মূর্তির পেটের মধ্যে সেটা কোনোভাবে আটকানো। সেটাকে বার করে এনে দেখলেন তার মধ্যে ঝলমল করছে একগাদা সোনার গয়না।

যোগানন্দ জানতেন মা মৃন্ময়ী। মাটি, কাঠ, খড়ের মূর্তি। এখন জানলেন, শুধু তাই নয়, মূর্তির জঠরের রাশি রাশি টাকা ও চোরাই গয়নাকেও তিনি পুজো করেছেন এতদিন।

পঞ্চপ্রদীপটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগানন্দ হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন মাটিতে।

পরদিন ম্যারেজ-রেজিস্ট্রার অফিসে নোটিশ দিয়ে ফেরবার পথে বিশ্বদেব আর রীণা দেখলো, কালীমন্দিরের সামনে দারুণ ভিড়। যোগানন্দ স্বামী নাকি পাগল হয়ে গেছেন, নিজের হাতে কালী-মূর্তি ভেঙে ফেলে এখন সে-ঘরের দরজা জানলাও ভাঙছেন।

রীণা বললো, ইস, মানুষটা কিন্তু ভালো ছিলেন—।

বিশ্বদেব বললো, দেখবে, নিশ্চয়ই ওঁর নাম এখন আরও বেশী ছড়িয়ে যাবে। পাগল মানেই তো বড় সাধক।

মনে মনে সে যোগানন্দের জীবনী লেখার ছক কাটতে লাগলো।

—শেষ—